প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৭১

প্রকাশক :
ফজলে রাব্বি
পরিচালক, প্রকাশনা বিক্রয় ও মুদ্রণ বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রণ :
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২/এ কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ :
সাহানা বেগম

"পূর্ব ময়মনসিংহের ছড়া" গ্রন্থের ছড়া সংগ্রহের মেয়াদ কাল ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। কলেজ জীবনের শুরুতেই পল্লীর ছড়া সংগ্রহ করার দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, ফলে কিছু কিছু করে ছড়া সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। সে ঝোঁক প্রবল হয় নেত্রকোণার উত্তর-আকাশ পত্রিকার সম্পাদক সু-সাহিত্যিক জনাব খালেক দাদ চৌধুরীর উৎসাহ-অনুপ্রেরণার ফলে। উত্তর আকাশ পত্রিকায় একাধিকবার ছড়ার উপর আলোচনা ছাপা হয়েছে। এই সূত্রে পরিচয় হলো বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক জনাব সিরাজ উদ্দিন কাসিমপুরীর সংগে। লোক-সাহিত্য চর্চার ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন সময়ে যে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তা ভোলার নয়। মূলত: তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও পরামর্শ না পেলে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের দুরূহ পথে নামা আমার সেই তরুণ বয়সে সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। ছড়া সংগ্রহের কাজে উৎসাহ পেয়েছি আমার শিক্ষক জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ নেত্রকোণা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান) এবং জনাব জমির উদ্দিন আহমদের (প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের গুরু) কাছ থেকে। সিলেটের 'আল-ইসলাহ'র সম্পাদক জনাব নূরুল হক টি, কে'র সহযোগিতার কথাও এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ছড়া সংগ্রহ এবং সম্পাদনার কাজে বিভিন্নভাবে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমার মা, টুনি পিসি ও মণি পিসি। ছোট বোন পিনু ও রানু, সুশীল মামা, নরোত্তম, আতাউর রহমান, বাসীউড়া গ্রামের পরম শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণলতা সাহা, ক্ষীরোদা বালা সাহা, আবদুল মালেক, জয়ন্তী দি, দীনেশ, আশীষ কুমার কাঞ্জিলাল— এদের কথাও কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণীয়।

বাংলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগের কাছে ঋণী এজন্য যে তাঁরা পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও সংশোধনী কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। যে সব খ্যাতনামা সাহিত্যিকের পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি তাঁদের কাছেও চির কৃতজ্ঞ থাকলাম।

নিবেদক,
জীবন চৌধুরী

লোক সাহিত্যের অপরিহার্য শাখাগুলোর মধ্যে ছড়া এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ছড়া যেহেতু লোক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংগ, তাই একে ছড়া-সাহিত্য বললে ভুল হবে না। ছড়া-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে লোক সাহিত্যের পটভূমিকার উপর কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

ডক্টর মাযহারুল ইসলাম বলেছেন, 'গঠন প্রকৃতি, মেজাজ এবং চারিত্র্য অনুসারে ফোকলোরকে পণ্ডিতগণ দু'ভাগে ভাগ করেছেন Material Folklore অর্থাৎ বস্তুকেন্দ্রিক লোকলোর এবং Formalised Folklore বা Non Material Folklore অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পকেন্দ্রিক লোক-লোর। বস্তুকেন্দ্রিক লোকলোর সমূহের মধ্যে লাংগল, জোয়াল, মই, বেড়া, বিভিন্ন রকমের মাটির পাত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির নাম করতে হয়—অর্থাৎ গ্রন্থ বা লিখিত কোন সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করেছে সে গুলোই বস্তুকেন্দ্রিক লোকলোর। অন্যদিকে যে সমস্ত সৃষ্টি শিল্প গুণান্বিত হয়েছে সে গুলোই সাহিত্য ও শিল্পকেন্দ্রিক লোকলোর। এগুলোর মধ্যে পড়ে লোকসাহিত্য, লোক শিল্প, লোক নৃত্য প্রভৃতি। লোক কাহিনী, প্রবাদ, ছড়া, লোকগীতিকা, লোক সংগীত, হেঁয়ালী, লোক বিশ্বাস, লোক বিদ্যা প্রভৃতি লোক সাহিত্যের অংগীভূত। মাটির পাত্র, তুলট কাগজে বা তালের পাতায় অশিক্ষিত শিল্পী পুথিগত বিদ্যার আশ্রয় না নিয়ে যে সমস্ত ছবি আঁকে সে গুলো, লোকভাস্কর, লোক

বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিকে লোক শিল্প বলা হয়। লোক নৃত্যকেও এক জাতীয় লোক-শিল্প বলাই সংগত, কেননা নৃত্য চারুকলার অনুভুক্ত।[১]

লোক সাহিত্যে সুর আছে, ভাষা আছে, আছে আশা-নিরাশার ছন্দ, রাগ-রাগিনীর সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, আর সারগর্ভ তত্ত্বগত বিশ্লেষণ। লোক সাহিত্য ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে জাগ্রত করে মানব জাতির বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন পরিবেশের মাধ্যমে পরিচালিত করে।

সৃষ্টিগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশে লোক-সাহিত্যের তাৎপর্য সেখানকার সামাজিক দিক এবং অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল। একটির সংগে অপরটির সাদৃশ্য বিশেষভাবে বর্তমান এবং ওতপ্রোতভাবে একে অন্যের সংগে জড়িত।

লোক সাহিত্য সমাজ-চেতনার দর্পণ। এতে মানব সমাজের আনন্দ-বেদনা আছে, আছে আবহমান কালের প্রেম-প্রতীক্ষার মূর্ছনা-দ্যোতনা।

ইংরেজী Folklore শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতভেদ আছে, যদিও আমরা সাধারণভাবে ইংরেজী Folklore শব্দটিকে প্রায়ই বাংলায় লোক সাহিত্য বলে থাকি। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী Material এবং Formalised Folklore উভয়কে লোক সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ Folklore-এর প্রতিশব্দ 'লোক বিজ্ঞান' করেছেন। পরে অবশ্য তিনি লোক-বিজ্ঞানের পরিবর্তে 'লোক বিদ্যা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। 'লোক শ্রুতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য। যেহেতু লোক সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের শ্রুত, আদৃত, সমাদৃত এবং লিখিত সাহিত্য সুতরাং এ হিসাবে লোকশ্রুতি বলা যেতে পারে। 'লোক বার্তা' ব্যবহার করেছেন ডঃ বাসুদেব শরণ আগরওয়ালা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'লোকযান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শ্রী শংকরসেন গুপ্ত ব্যবহার করেছেন 'লোক বৃত্ত' শব্দটি। শ্রীরাম নরেশ ত্রিপাঠি Folklore-কে বলেছেন 'গ্রাম্য সাহিত্য' ডঃ মাযহারুল ইসলাম 'লোকলোর' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী।

---

১ লোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন : ডঃ মাযহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, পৃঃ ১১-১২।

ইংরাজী Folklore শব্দ আজকে যে লোকমুখে ঘুরে ফিরছে তা উদ্ভাবিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে এবং তা উদ্ভাবন করেছিলেন প্রাচীন লোক-বিজ্ঞানী William John Thomas। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকের দিকে প্রাচীন প্রথা, লোক সাহিত্য এবং অতীত সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি উত্তরোত্তব অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ বৃদ্ধির ফল হিসাবে ১৮৭৮ অব্দে লণ্ডন শহরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল Folklore Society এবং প্রকাশিত হ'তে লাগলো 'Folklore' পত্রিকা। এর মাত্র দশ বছর পর ১৮৮৮ অব্দে একই আদর্শে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল Folklore Society এবং প্রস্তাব গৃহীত হ'ল Journal of American Folklore পত্রিকা প্রকাশের জন্য। পূর্বোক্ত দু'টি পত্রিকাই আজ পর্যন্তও নিয়মিত প্রকাশিত হ'য়ে আসছে। এরপর থেকেই ইংরেজী Folklore কথাটি বিপুল বিস্তৃতি লাভ করলো; জার্মান ভাষায় একই আদর্শে তা' হ'ল Die-Folklore, ফরাসী ভাষায় Le-Folklore, ইটালীতে IL-Folklore এবং স্পেনীয় ভাষায় El-Folklore[১]।

পল্লীর হাঠে মাটে ঘাটে বাটে যে সাহিত্য সম্পদ ছড়িয়ে আছে তার দিকে আমরা চোখ তুলে ভাল করে কোন দিনই চাইনি। পাশ্চাত্য দেশের শিল্প, কৃষ্টি, শিক্ষা, সভ্যতায় এদেশের মানুষ নিজেদের দুঃখ-দৈন্য সম্যক উপলব্ধি করল। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে সাহিত্য সাধনা, সমাজ-সংস্কার, সংস্কৃতি চেতনাবোধ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল—তখন থেকেই বিলুপ্তপ্রায় মূল্যবান গাঁথা সংগ্রহের কাজে অনেককেই মনোনিবেশ করতে দেখা গেল। এ দেশের বিলুপ্তপ্রায় পল্লীর সাহিত্যভাণ্ডার দর্শনে আমেরিকার লোকবিজ্ঞানীরা অভিভূত হয়ে পড়লেন। একজন আমেরিকান লোক-বিজ্ঞানী বলেছেনঃ "Both India (Pakistan) and Persia spring from Indo European tradition which was also parent to the civilization of Greece and Rome, Europe and modern America."

ভারতীয় উপমহাদেশের লোক-বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রী লাল বিহারী দেকেই প্রাচীনতম বলে সকলে মনে করেন। তিনি সর্বপ্রথমে Folktales

১ লোক সাহিত্য—আশরাফ সিদ্দিকী, পৃঃ ৩৫-৩৬।

of Bengal পুস্তকে লোকমুখে প্রচলিত উপকথা, প্রবাদ, ছড়া এ সকলকে একত্রিত করে তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের চোখে তুলে ধরেছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সুদূর প্রাচ্যের Anderson's Fairy tales ও Gorimss's Fairy Tales এর চাইতে এ সকল হারানো সম্পদ কোন অংশে কম নয়। তারপর থেকে সে বিস্মৃত ও অবলুপ্ত ছড়া, প্রবাদ, গীত, হেঁয়ালী ইত্যাদি পল্লীর এক একটি নাড়ীর সম্পর্কবৎ রক্তবিন্দুকে কুড়াতে শুরু করলেন অনেক সাহিত্য সাধক। তাঁদের মধ্যে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রী চন্দ্র কুমার দে প্রমুখ একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধকদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোক সাহিতের একটি জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে ছড়া। দেশী এবং বিদেশী সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সাহিত্যে ছড়া এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। বিশেষ করে ছড়া শিশদের প্রাণের বস্তু, তাদের চরিত্রে ছড়ার প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জল বাতাস ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি শিশুদের প্রাণ মনকে সজীব সতেজ করে তুলতে ছড়ার ভূমিকা অপরিসীম। ছড়া, সাধারণ কথায় ছড়িয়ে আছে যা—তাই-ই ছড়া। ছড়ার মাঝে দেখি সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়, মানুষের চিরাচরিত জীবনের প্রতিফলন, দৈনন্দিন জীবনধারা কিংবা কর্ম প্রবাহের অগোছালো বাস্তব চিত্র।

ছড়ায় আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির আদিমতম জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রকৃতি, কর্ম-চাঞ্চল্য, মানসিকতা, চেতনা আর ভাবনা। সামগ্রিকভাবে ছড়া সাহিত্যকে আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে চেয়েছি। ভাগগুলো হলো:

(ক) ছড়া শিশুদের প্রাণ, (খ) ছড়া সমাজ-জীবনের কর্মপ্রবাহ, (গ) মুখ-নিঃসৃত ছড়া বনাম লোক তৈরী ছড়া, (ঘ) একই আবেদনে ভিন্ন ভাষা চেতনায় ছড়া, (ঙ) আধুনিক যুগের আবেদন বহনকারী প্রচলিত ছড়া, (চ) বিভিন্ন আবেগে ভিন্ন ধরনের ছড়া।

ক. ছড়া শিশুদের প্রাণ

শিশু ও ছড়া, ছড়া ও শিশু—কথা দু'টোর সম্পর্ক বেশ নিবিড়। ছড়া মৌখিক সাহিত্যের আদি সংস্করণের অন্যতম, তাই লক্ষ্য করা যায়, ছড়ায় ভাব প্রকাশের কৌশল আছে, কিন্তু ভাষায় তেমন সুসংগত চিন্তার বিকাশ নেই। কাঁচা কথার গাঁথুনী, এর বস্তুজ্ঞান ভাব-সুষমামণ্ডিত নয়, তবু যুগ-যুগান্তের সামাজিক চেতনাবোধ নিয়ে আবহমানকাল ধরে এর বিকাশ। আধুনিক লেখ্য ছড়া সাহিত্যে ভাষার অলংকার, শুদ্ধ ভাষা-রূপের প্রাধান্য, মার্জিত ও সুগঠিত বিকাশ আছে।

মায়ের কোল থেকে শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন শুধু কাঁদতে শেখে, ধীবে ধীবে বেড়ে ওঠে, এবং সংগে সংগে তার চোখে নেশা জাগে, ঠোঁটে ভাষার ছাপ লাগে, সে তখন কিছু বলতে চেষ্টা করে। এর পব ভাষাবোধ জাগে এবং ক্রমে ক্রমে ছড়ার জগতে এসে উপনীত হয়। এজন্য ছড়া-সাহিত্য শিশুর অবুঝ হৃদয়ের, অবুঝ মনের সংগে একাত্ম। বহুবিধ শিক্ষা তারা ছড়ার মাধ্যমে পেয়ে থাকে। নার্সারী রাইমস্-এর মত কত যে ছড়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচলিত আছে ইতিহাসই তার সাক্ষ্য প্রদান করে।

শিশু বিষয়ে ছড়া শিশুব কোমল নাড়ীর সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত। বাংলাদেশের পরিবেশই হয়তো বিভিন্ন ছড়ার মনের ভূমিকে গড়ে তুলেছে। শিশুদের ছড়া আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছ ভাসমান। মেঘ বারিধারায় নামিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহ রসে বিগলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।"[১]

এ প্রকৃষ্ট উদাহরণ থেকে আমরা এটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে, ছড়া শিশুর কোমল মনে যে আনন্দের খোরাক দেয়, পরবর্তী জীবন তা থেকে যথেষ্ট প্রভাবিত হতে পারে।

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লোক সাহিত্য: বিশ্ব ভারতী ১৯৬৪, প: ৪৮-৪৯।

যিনি শিশুবিষয়ক ছড়া রচনা করবেন তাঁকে অবশ্যই শিশুমনকে বুঝতে হবে। তা না পারলে শিশুছড়া লেখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কুঁড়ি যদি বিনষ্ট হয়, তবে তা' হতে ফুলের আশা করা যায় না। সুতরাং ফলের আশাও নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হয়। সেই শিশু-মন না থাকলে শিশু ছড়া রচনা করার কোন অর্থ নেই।

শিশুদের ঘুম-পাড়ানো ছড়াগুলো সত্যই বিস্ময়কর। শিশুদের একটা স্বপ্নরাজ্য আছে এবং সে রাজ্যের গুপ্ত-কুঠরিতে আছে শিশুর মন, যে মনে ফুল ধরেছে।

অতিলৌকিকতার রোমাঞ্চ তাদের কাছে শিহরণ আনে। ভূত-প্রেতের কাহিনীগুলো তাদের কাছে বিস্ময় জাগায় এবং এ'তে তারা অনেক সময় গভীরভাবে বিশ্বাসও করে।

খ. ছড়া সমাজ জীবনের কর্মপ্রবাহ

সমাজ জীবনে ছড়ার প্রভাব স্বতঃস্ফূর্ত। সমাজ থেকেই ছড়ার আবির্ভাব, সৃষ্টি, তাই ছড়ার সৃষ্টিগত ক্ষেত্রই হলো সমাজ।

সমাজ জীবনের গতিধারার সংগে ছড়ার আবেদন সম্পৃক্ত, সংশ্লিষ্ট।

তবে কোন্ সমাজ থেকে কিংবা কাদের দ্বারা ছড়ার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস বলা মুস্কিল। তবে এগুলো যে প্রবাহমান বায়ুর মতো অনেক যুগ থেকে পল্লী সমাজের আলোছায়ার ভেতর দিয়ে চলে আসছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রাচীন যুগের সংগে বর্তমান সময়ের ভাষাগত পরিবর্তন বা পার্থক্য এসেছে। সামাজিক পরিবর্তনের সংগে ছড়ার পরিবর্তনের ইতিহাসও চিহ্নিত। তবে ছড়ায় আবেদনের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আসে নি। পার্থক্য যা এসেছে তা ভাষায়। এ ছাড়া ছড়ার অনুভূতি, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-বিরহ, কৌতুক-উপহাস, শিষ্টাচার এবং আনুষংগিক মানসিকতার আবেদন এখনো অবিকৃত।

ছড়া মানুষের চিরন্তন বাস্তব কথাগুলোকে সাজিয়ে তুলেছে। দুঃখে দুঃখ বহন কিংবা সুখে সুখের বার্তা বহন করে বলে ছড়ার আবেদন লোক-সমাজে কোন দিনই ম্লান হয়নি।

একই সংগে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের বৈপরীত্য লোক-মনে যে কৌতুহল জাগিয়েছে তার প্রকাশ ঘটেছে নীচের ছড়ায়।

রৌদ হৈছে ম্যাগ হৈছে
খ্যাক শিয়োলীর বিহ্যা হৈছে
চন্‌ঢৈল্যা রৈদ উঠ্‌।

(রাজশাহী)

অন্য একটি ছড়ায় ঝড়ের সম্ভাবনাকে এভাবে দেখান হয়েছে।

পবণ ব্যাডা হনুমান
লেংগুরঅ ধইরা বাতাস আন
লেংগুর গেলঅ ছিইড়া
বাতাস আইল উইড়া।

(নেত্রকাণা)

মিলন কিংবা বিরহ-ব্যথার পরিচয় পাওয়া যায় এ ছড়াটিতে

সইলো সই
নাল্যা খেতে বই
নাল্যা খেতে বইয়া বইয়া
দুঃখের কথা কই।

(নেত্রকোণা)

পল্লীর সরল-শান্ত এক বিবাহিতা রমণীর মনের নিগূঢ় আরাধনা, নারীত্ব, ও ভালবাসার এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষার কথা এ ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে।

মন দিইছি যারে
প্রাণ দিইছি তারে,
বারে বারে চালি পারেও
আর দেব না কারে।
সব শক্কুর মুখে ছাই
মনের মত স্বামী পাই।
স্বামীর আগে মরণ
আমার য্যানো হয়,
এই কথাটা জানাই আমি
ঠাকুর দেবতার পায়।
সব শক্রু দূরি যাক
স্বামী দেবতা বাঁইচে থাক।

(যশোহর-খুলনা)

মেয়ের মালো অরুণা
হলদী মরিচ বাড়-অনা
জামাই রইছে নদীর কুল
ফুইট্যা রইছে চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইয়ে আনন্দে।

(নেত্রকোণা)

জীবনে অভিমান আছে সে অভিমানের প্রকাশও বলেছে ছড়ায় ঃ

ছুড়ি কান্দেরে কান্দেরে
শাড়ী কিনা দে
হাল্কা মাপা চিরা শাড়ী
উড়ায় বাতাসে ।

(রাজশাহী)

আমতালাতে বাজনা বাজে,
কাঠাল তলায় বিয়া
কলির রংগ জ্বালায় অংগ
বুঝায় কিবা দিয়া ।

(রাজশাহী)

ছড়ায় ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রতিধ্বনি লক্ষ্যণীয় ঃ

লাজ নেই লজ্জা নেই
সেবে বাঁধে খোঁপা
আগুন লাগিযে পুড়িযে দেব
নিলজ্জির চোপা ।

(রাজশাহী)

ছড়ায় ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঃ

চুল নাই বেডি চুলের লাইগ্যা কান্দে
বাইশ মুড়া পাট দিয়া
চুলের খোঁপা বান্দে ।

(নেত্রকোণা)

আইবুড়োর মনের আক্ষেপ ঃ

আমার জোয়ারী ছিল যারা
তিন ছেলের বাবা হল তারা
আমার এমন পোড়া কপাল
আর কতদিন পরে হরি
ফুটবে আমার বিয়ের ফুল
আমার বিয়ে নিশ্চিন্তপুর।

(যশোর-খুলনা)

সংসার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকাশ নিম্নরূপ ঃ

মইলনারে মাইল্যা বুড়ি
পাইরা দিতাম মাডি
মুখে দিয়া ভইরা দিতাম
বউরা বাঁশের গুঁড়ি।

(নেত্রকোণা)

কাকে কলসী চড়কপাত
গিন্নি হওয়ার বড় সাধ
গিন্নি মলি ছিরি দেবো
আমি গিন্নি কবে হব।

(যশোর-খুলনা)

সংসার জীবনে ভালবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতার বিকাশ ঘটে কিন্তু স্বামীর দূর-প্রবাস গমন ঘটলে অথবা এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে প্রেমাসক্ত স্ত্রীর মন অসম্ভব ব্যথিত হয়ে উঠে, তার মন বলে উঠে ঃ

"ঘুম হয় না ঘুম হয় না
বালিশ মাথায় দিয়া
আসবে কবে রাত খেয়ালি
যাবে আমায় নিয়া।"

এমনি কত রজনী বিনিদ্র কেটে যায় স্ত্রীর। সে ব্যাকুল হয়ে উঠে, অধীর আগ্রহে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে।

সন্তানের শিশুসুলভ আচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং স্নেহে সিক্ত হয়ে উঠে তার হৃদয়।

মা আমায় খাবার দাও
ধর বাচা খাবে নাও
খাজার মধ্যে পোকা
মা তুমি বোকা।

(ঢাকা শহর)

ছড়ায় পাওয়া যায় পল্লীর কোন মেয়ের রূপের বর্ণনা কিংবা প্রকৃতির যে কোন বস্তুর সংগে তুলনীয় চিত্র।

বর্ণনা মনোমুগ্ধকর। এ সব ছড়ার ছন্দ-মাধুর্য একাধারে হৃদয়গ্রাহী এবং মনোরম।

বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা
ঘরের শোভা ডোয়া
নারীর শোভা সিঁথের সিদুঁর
পদ্মার শোভা খেয়া।

(কুষ্টিয়ার ছড়া/সংগ্রাহক
অধ্যাপক আবদুল জলীল)

অথবা,

বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা
ঘরের শোভা উশারা
দাঁতের শোভা মিশ্‌রী মাজন
চক্ষের শোভা ইশারা।

(ময়মনসিংহ)

অথবা,

বাড়ীর সোগ্যা কলাকচু
ঘরের সোগ্যা বেড়া
পুরুষের সোগ্যা মুখে ভেড়া,
নারীর সোগ্যা মাথার কেশ
ভাইর সোগ্যা বোন
থালের সোগ্যা গেলাস আর
হরিণীর সোগ্যা বন।

(যশোর-খুলনা)

সংসার-জীবনে সুখের আশা করা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক সময় যে কোন কারণে সে সুখ শত দুঃখবহ হয়ে দেখা দেয়। নিজের জীবন এবং সংসারের প্রতি মানুষ এ পর্যায়ে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

সুখ সুখ পরানের বরি
সুখের ঘরে কপাট দিয়ে
আমি দেশে দেশে ফিরি,
সুখ নাইরে ভাই।

(যশোর)

অসহনীয় দুঃখে, অসহ্য বেদনায় অনেক সময় রমণীরও মন যখন মুহ্যমান হয়ে ওঠে তখন তাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ঃ

ভাতার নেই পুত নেই,
সিতে ভরা সিঁদুর
ঘর নেই দোর নেই
ঘর ভরা ইঁদুর।

(যশোর)

জীবনের এ বিপুল নিঃসংগতা কিংবা একাকীত্ব বিষময়, দারুণ কষ্টের সব কিছু যেন শূন্য হয়ে আসে।

ক্ষুধা মানুষকে দেশান্তর গমনে বাধ্য করেছে।

মরলাম মরলাম আমি
খিদার লাগি
এই দেশ ছাইড়া দিয়া
সকাল ভাগি।
(পূর্ব-ময়মনসিংহ)

অনির্দিষ্ট এ যাত্রা, অনিশ্চিত এ পথচলা।

গ. মুখনঃসৃত ছড়া বনাম লোক তৈরী ছড়া

লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত এসব ছড়া সৃষ্টির সঠিক সময় নিরূপণ করা সম্ভব নয় তা' আগেই বলা হয়েছে। এ সকল ছড়া লোক-শ্রুত, লোক সমাজে সমাদৃত। এর একক কোন রচয়িতা নেই। সমাজ মানসের হাতেই তার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে অধুনা লিখিত ছড়া সাহিত্য এদিক দিয়ে সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। এ গুলোর রচয়িতারা শিল্পমন ও সমাজ সম্পর্ককে সামনে রেখে ছড়া নির্মাণ করেন। সুতরাং ভাষাগত এবং আবেদনগত দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য অনেক এবং তা মৌলিক। সংক্ষেপে বলতে গেলে যে সব ছড়া আদিম যুগ থেকে লোকমুখে শ্রুত হয়ে আসছে সে গুলো মুখনিঃসৃত ছড়া। এর একটি নিদর্শন নিম্নরূপ ঃ

রইদও উড়ে মেঘও নামে
শিয়াল বেডায় বিয়া করে
শিয়াল বেডা মেঘে ভিজে।
কইনা থাকে নানান কাজে।
(নেত্রকোণা)

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সংকলিত ছড়ায় আছে :

ঘুম-পাড়ানী মাসী পিসি
ঘুমের বাড়ী যেয়ো
বাটা ভরা পান দেব
গাল ভরে খেও।

এর সংগে তুলনীয় নেত্রকোণার ছড়া :

ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি
আমরার বাড়ীত যাইও
বাটা ভরা পান দিব
গাল ভইরা খাইও।

এখানে ভাষার পার্থক্য সামান্যই।

যেয়ো — যাইও
দেব — দিও
ভরে—ভইরা
খেও—খাইও

এখানে সাধু ও কথ্য ভাষাগত পার্থক্য ধরা পড়েছে যদিও ছড়া দু'টোর আবেদন অভিন্ন।

ঘ. একই আবেদন সম্ভাবনায় ভিন্ন ভাষা চেতনায় ছড়া

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া সম্পর্কে আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, সব অঞ্চলেই ছড়ার এক ধরনের আবেদন রয়েছে এবং এক অঞ্চলের ছড়ার সংগে অন্য অঞ্চলের ছড়ার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য হল ভাষাগত। অনেক সময়েই লক্ষ্য করা গেছে একই মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকায় উচ্চারিত ছড়ার মধ্যেও ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

উদাহরণস্বরূপ নেত্রকোণার দুয়েকটি ছড়া এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন :

হকুন রাজা গিরধনী
একটু দারু দিবেনি
মরা খাইয়া খচ্চর
তুইন বড় নচ্চর ॥

অথবা, হকিন রাজা গিরধনী
একটু অষুদ দিবেনি
—দিয়াম দিয়াম বিকালে
আবুদুব ঘুমাইলে।

অথবা, আলু পাতার তালু তালু
ভেন্নার পাতার দই
সকল জামাই খাইতে বইছে
গোদা জামাই কই ?

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দিব মেপে

(নেত্রকোণা)

এই তিন স্থানে প্রচলিত ছড়াগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিষ্টি শব্দটি সর্বত্রই আছে। 'দেবো' শব্দটি রাজশাহী ও যশোরে প্রচলিত, কিন্তু নেত্রকোণায় দেবোর বদলে দিব প্রচলিত।

আবার মেপে শব্দটি প্রত্যেকটিতে যেমন সাধারণ, ঝেঁপে আর চেপের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। তাছাড়া মধ্যের পরিবর্তে দ্বিতীয় ছড়ায় হয়েছে প'লো এবং জামাই বাবুর স্থলে জামাই বিটা।

অন্যত্র : কতুর কতুর ময়না
কাল দিব তোর গয়না
আজু বিয়ে হয় না
ভাত খাসতো আয়না।
(যশোর-খুলনা)

কাতুর কুতুর ময়না
কালদেব তোর গয়না
আজো বিয়ে হয় না
ভাত খাসতো আয়না।
(রাজশাহী)

কাতুর কুতুর ময়না
কাইল দিব গয়না
বইনে দিব পাটের শাড়ী
যারে তর লেংরা হাইয়ের বাড়ী।
(ময়মনসিংহ

এখানেও একই বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভংগী লক্ষ্য করা যায়

অথবা, আলু পাতার থালু থালু
ভেন্নার পাতার দই
সকল জামাই খায়া গেল
মাইজান জামাই কই?

একই ছড়া সামান্য আঞ্চলিক পার্থক্যের ফলে এ ধরনের ব্যতিক্রমী রূপ গ্রহণ করেছে। ঢাকা থেকে সংগৃহীত ক্রীড়া বিষয়ক ছড়ায় আছে :

গুডি গুডি তেলেঙা
তরে লইয়া গেলাম গা।

এখানে জিতেঙা আর তেলেঙা কিংবা খেলেঙা শব্দগুলো প্রায় একই রকম। প্রায় একই ভাবে প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন রূপে। তগ সাথে এবং তরে লইয়া, দু'টোর মধ্যে আঞ্চলিক ভাষারূপের ঈষৎ পার্থক্য দেখা যায়।

আর একটি ছড়াঃ

আয় বিষ্টি ঝেঁপে
ধান দেবো মেপে
ধানের মধ্যে পোকা
জামাই বাবু বোকা।

(রাজশাহী)

আয় বিষ্টি চেপে
ধান দেব মেপে
ধানে পলো পূকা
জামাই বিটা বোকা।

(যশোর-খুলনা)

বৃটিশ শাসনকালে এখানকার লৌকিক ছড়ায়ও পাশ্চাত্য ভাবধারার ছাপ পড়েছে। এসব ছড়ায় কোন কোন অংশে তির্যক ব্যংগও পরিস্ফুট।

চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বিবির বৈঠকখানা
রাজবাড়ীতে যাইতে
পান-সুপারী খাইতে
পানের উপর মান কাঁটা
স্প্রিংয়েতে চাবি আঁটা।

(নওগাঁ)

ওপেনটি বায়স্কোপ
টাই-টুই টায়স্কোপ
চুলটানা বিবিয়ানা
লাটবাবুর বৈঠকখানা
লাট বলছে যাইতে
পান-সুপারী খাইতে
পানের আগায় মরিচ বাঁটা
স্প্রিং-এর চাবি আঁটা।

(ঢাকা)

এ ছড়ায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—চুলটানা বিবিয়ানা, পান-সুপারী এবং স্প্রিংয়ে চাবি আঁটা শব্দ কয়টিতে; আবার বৈসাদৃশ্য রয়েছে, যেমন সাহেব বিবি, লাটবাবু; পানের উপর পানের আগায় এবং মান কাঁটা, মরিচ বাঁটা শব্দগুলোতে।

ঘুম পাড়ানো ছড়াতেও তেমনি করে সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

আয় চাঁদ আয়
কালো গাইয়ে দুধ দিব
দুধ খাবার কোরা দিব
মাচার তলে জাগা দিব
সানকি ভরা টাকা দিব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

(রাজশাহী)

আয় চাঁদ লড়ে আয়।
সোনার ঘোড়া চড়ে আয়।
গাই দিমু দানে
দুধ দিমু পানে

আয় চাঁদ দড়বড়
ভাইয়ের চোখ টিপে ধর
মাই নাই এখানে
ঘুম যাও বিদানে।

(মানিকগঞ্জ)

আয় চাঁদ আয়
আয় চাঁদ লইড়য়া
কলা গাছে চইড়য়া
কলা দিয়াম ছুইলা,
'দুধ দিমু টাইল্যা।

(নেত্রকোণা)

সংসার বিষয়ক ছড়াগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত এ ধরনের একই প্রকার ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে এবং সংসার জীবনের এক নিখুঁত চিত্র সেখানে ধরা পড়ে।

ঘরে গেলাম শাশুরী মারলো টুকনা
বাইরে থেকে স্বামী মারলে ডেলা
পাঁচ টাকার ঢাকাই শাড়ী
ছিঁড়ল কি করে?
দাদা আগে আসুক বাড়ী
মার খাওয়াব তরে।

(যশোর-খুলনা)

ভাসুর: ছোট ভাইয়ের বউগো তুমি
নামটি তোমার হীরা
চৈদ্দ সিকার ঢাকাই শাড়ী
কেমনে গেল চিরা?

বউ ঃ কেচা বাঁশের বেড়া ছিল
ঘন ঘন গিরা
ভাসুর দেইখ্যা ঘোমটা দিতে
আঁচল গেছে চিরা ।

(ময়মনসিংহ)

ঙ. আধুনিক আবেদন বহনকারী ছড়া

অধুনা কি পল্লী অঞ্চলে নতুন চেতনা কিংবা দৃষ্টিভংগী নিয়ে নতুন ছড়া রচিত হচ্ছে? যেসব ছড়া আধুনিক যুগের আবেদন বহন করে পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত সেগুলো রচিত হচ্ছে বললে ভুল হবে। তবে এমন কিছু সংখ্যক ছড়া রয়েছে যা বর্তমান যুগে সমাদৃত এবং সামাজিক প্রভাবে উজ্জ্বল হযে উঠেছে। এতে ভাষার প্রভাব পড়েছে, চেতনার প্রভাবও অনেকখানি মূর্ত্য হয়ে উঠেছে।

মায়ে রান্দে তিতা তিতা
বইনে রান্দে পড়া ছাই
লীলা রান্দে খাশা মুগের ডাইল।
মার শাড়ী তিন টাকা
বইনের শাড়ী পাঁচ টাকা
লীলার শাড়ী একশ' পাঁচ টাকা
মায়ে পিইন্দা ঘরে যায়
বইনে পিইন্দা নাইওর যায়
লীলা পিইন্দা শহরে বেড়ায়।

এ ছড়াটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে মানুষ যখন গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে শুরু করলো, গ্রামীণ অবস্থার শোচনীয় পরিণতি হতে শুরু হল, তখনই

হয়তো এ ছড়াটির জন্ম হয়েছে। গ্রামমুখী মানুষ শহরের জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে। যেমন প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় মায়ের শাড়ী তিন টাকা, পরবর্তীতে বোনে পরে পাঁচ টাকা দামের শাড়ী এবং সর্বশেষ পর্যায়ে লীলার মত নতুন মেয়ে যে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে শহরমুখী হয়েছে, সে পরতে শুরু করে একশ' পাঁচ টাকা দামের মূল্যবান শাড়ী। পল্লীর সহজ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সংগে তুলনীয় তার শাড়ীর মূল্য একটু বেশী বলে মনে হয়। এতে সমাজ ও মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র দর্শনের মত প্রতিফলিত। যাকে এখানে পল্লী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, বইন নাইওর যায়, সেও আস্তে আস্তে শহরমুখী হওয়ার চেষ্টায় আছে এবং শাড়ীর মূল্য পাঁচ টাকা তার, গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে তাকে বেশ মানায় এ শাড়ীতে। আর লীলা একশ' পাঁচ টাকার শাড়ী পরবেইতো।

তাছাড়া আধুনিক পরিবেশে, শহরে লীলাকেই পছন্দ বেশী। একাধারে সে স্ত্রী, অন্যদিকে কৃত্রিমতার লাবণ্য তার দেহে। সেজন্য মায়ের কিংবা বোনের রান্না তিক্ততায় পরিপূর্ণ তার কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক!

অন্য একটি ছড়া ঃ

কলির এই ব্যবহার
মা-বাপের ভাত নাই
বউয়ের অলংকার।
মায় পিন্দে চিরা কাপড়
গিরঅ গারঅ দিয়া
বউয়ে পিন্দে নানান শাড়ী
বারান্দা লাগাইয়া।

মা-বাবার বহু আকাঙ্ক্ষিত আশাকে চূর্ণ করে দিয়ে নব্য-শিক্ষিত ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত।

রেল-আবিষ্কার আধুনিক সভ্যতার এক অন্যতম নিদর্শন এবং অনেক ছড়ায় রেলের উল্লেখ আছে। এগুলো সাম্প্রতিক কালের প্রভাবযুক্ত।

যেমন ;

ময়নারে রেল যাইত্যাছে
রেলের কপাট খুইল্যা দেখি
বাজান আইতাছইন।

কিংবা ঝক্কর ঝক্কর ময়মনসিং
ঢাকা যাইতে কত দিন ?

তা' ছাড়া ছাতার ব্যবহারকে কেন্দ্র করে হয়তো নীচের ছড়াটির প্রচলন হয়েছে ঃ

আইলরে সিলকারের ছাতি
সিলকারের কুড়া
বাজারে মিলেনা ছাতি
দশ টেকা তার জোড়া।

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক কুইনাইন আবিস্কারের ফলে নীচের ছড়াটির আবির্ভাব ঘটেছে।

আইলরে ম্যালেরিয়া জ্বর ময়মনসিংহ জিলায়
কুইনাইন বড়ি খাইতে খাইতে মাথাডা ঘুরায়

'টেডি' সভ্যতাকে নিয়েও ছড়া রচিত হয়েছে।

টেডি টেডি ভাব
কাপড়ের অভাব
কাপড় নাই বাজারে
ছিপে ছিপে হাডেরে

কিংবা টেডি টেডি তেজপাতা
টেডির বউ কলিকাতা
টেডি যদি জানত
চুলে ধইরা আনত।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তমূলক ছড়া থেকে একটা অনুমানে আসা যায় যে, পরিবেশ এবং সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন নতুন ছড়ার আবির্ভাব হচ্ছে।

চ. বিভিন্ন আবেগে ভিন্ন ধরনের ছড়া

শিশু মনোপযোগী ছড়া, মেয়েলী ছড়া, ঘুম-পাড়ানো ছড়া, খেলাধূলা বিষয়ক ছড়া ছাড়াও অনেক ধরনের ছড়ার প্রচলন আছে। উচিত বচন বা প্রবাদবাক্যে ধাঁধা এগুলোও এক ধরনের ছড়া। খনার বচনে প্রবাদবাক্য বা উচিত বচন বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। ছড়া দিয়েই এগুলো বলতে হয় এবং ধাঁধা প্রকৃতপক্ষে ছড়ার গাঁথুনিতে সমৃদ্ধ।

সংসারবিষয়ক ছড়াগুলো এক ধরনের গীত। পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা কোন কোন উৎসবে এগুলো সুর করে গেয়ে থাকে। জামাই ঠকানো ছড়াগুলোও এমনি এক শ্রেণীর গীতধর্মী বস্তু। অনেক মেয়ে একত্রিত হয়ে এ ধরনের অনেক ছড়া সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকে।

'কুড়া' খেলার জন্য ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক ছড়াও মেয়েরা গান হিসাবে গায়। প্রকৃতপক্ষে পল্লীর সব বাধাবুলিই তো ছড়া। ছড়া গান, ছড়া মানুষের প্রাণ। ছড়া পল্লী জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ছড়াগুলো একঘেঁয়েমি দূর করে। বিচিত্র রকমের স্বাদ, ও আবেদন নিয়ে ছড়াগুলো পল্লীর সর্বত্র বিরাজমান।

পূর্ব ময়মনসিংহের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব ময়মনসিংহ বলতে সাধারণতঃ ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চল তথা নেত্রকোণা মহকুমার সমগ্র এলাকা, কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ময়মনসিংহের আরও কতিপয় এলাকাকেই বুঝায়। প্রধানতঃ গোটা নেত্রকোণা এর আওতাভুক্ত। পূর্ব ময়মনসিংহও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের মত নদীবহুল। প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোরম।

কংশ, ধনু, মগরা, সোমেশ্বরী, উবধাখালি নদী বয়ে চলেছে ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলের ভেতর দিয়ে। এগুলো লোক সাহিত্যের উৎস হিসাবেই বহমান।

এ পরিবেশ থেকে জন্ম নিয়েছে নানা প্রকারের ছড়া, গাঁথা, রূপকথা, ধাঁধা, এক কথায় লোক সাহিত্যের অমর সম্পদ।

পূর্ব ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, অসংখ্য ভাটিয়ালী গান, জারী, সারি ইত্যাদি। বিল-ঝিল অঞ্চলেই এ ধরনের গানের প্রভাব বেশী করে পড়েছে।

তাছাড়া ষড়ঋতুর বিচিত্র প্রভাব পূর্ব ময়মনসিংহের নর-নারী নির্বিশেষে সবাইকে কাব্যিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যার ফলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভাবুক হয়ে উঠেছে, হয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতি চেতনা বিলাসী।

পূর্ব ময়মনসিংহের লোক-সাহিত্যের ভাষা মিশ্র আঞ্চলিক। 'স'-এর উচ্চারণ 'হ' হিসেবে এবং কোন শব্দের 'ক্রিয়া' পদে বাইন, তাইন, যাইন, তান ইত্যাদি রূপ লক্ষ্যনীয়। যেমন ক্রিয়াপদ করব বা করিব, এখানে সাধারণ উচ্চারণে দাঁড়ায় করবাম, কাল অনুসারে কতিপয় ক্রিয়াপদের রূপ দেয়া গেল।

সাধু ভাষা	আঞ্চলিক শব্দোচ্চারণ	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
দেখি	দ্যাখি	দেখতাছি	দেখতাম	দেখবাম
যাওয়া	যাওন	যাইতাছি	যাইতাম	যাইয়াম
মরিব	মরব	মরতাছি	মরতাম	মরবাম
বাওয়া	বাওন	বাইতাছি	বাইতাম	বাইবাম/বাইয়াম
আসিল	আইল	আইতাছে	আইত	আইব
চেতাইয়া	চেতানি	চেতাইতাছি	চেতাইতাম	চেতাইয়াম
খাওয়া	খাওন	খাইতাছি	খাইতাম	খাইয়াম/খাইবাম
দেওয়া	দেওন	দিতাছি	দিছিলাম	দিয়াম/দিবাম
বাঁধা	বান্ধন	বান্‌তাছি	বান্‌তাম	বানবাম

সাধু ভাষা	আঞ্চলিক শব্দোচ্চারণ	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
গিলিয়াফেলা	গিলা ফালানী	গিল্তাছি	গিল্তাম	গিল্বাম
আসিয়াছেন	আইতাছইন	আইতাছইন	আইতাছিলাইন	আইবাইন
হবে	অইব	অইতাছে	অইতাছিল/অইছিল	অইব
উড়া	উড়ন	উড়তাছে	উড়তাছিল	উড়ব
খাইত	খাইত	খাইতাছে	খাইছিল	খাইব
করিতেছিল	করতাছিল	করতাছে	করতাছিল	করল
আসিল	আইস্ল/আইল	আইতাছে	আইত	আইব
দেখিয়া	দেখ্যা	দেখতাছে	দেখ্ছিল	দেখ্ব
ঝাড়া	ঝাইড়া	ঝাড়তাছে	ঝাড়ছিল/ঝাড়তাছিল	ঝাড়ব
ডাকিব	ডাক্ব	ডাক্তাছি	ডাকতাম	ডাক্বাম
নিয়া	নিওন	নিতাছে	নিতা/নিতাছিল	নিব
যাইবে	যাইব	যাইতাছে	যাইতাছিল/যাইত	যাইব
উঠা	উঠ্ন	উঠতাছে	উঠ্ছিল	উঠ্ব
থাকা	থাকন	থাকতাছে	থাক্তাছিল	থাকব
পরা	পরন	পরতাছে	পর্ত	পর্ব
ঘুমান	ঘুমান	ঘুমাইতাছি	ঘুমাইতাছিল/ঘুমাইছিল	ঘুমাইব
পরানো	পরান	পিন্দাইতাছে	পিন্দাইছিল	পিন্দাইব

তা'ছাড়া শব্দে নি, রে, উ, গো, স, ই, '্য' য-ফলার মতো বর্ণের স্বাভাবিক প্রয়োগ হয়। নি, আনি, তাম, যায় এগুলো উপসর্গ যেমন ঃ

করে	কবেরে	করেগো	করেলো
যাওয়া	যাওন	যাইতানি	
শালা	শালারে		
কাজ্য	কাইজ্যা		
হাস্য	হাইস্যা		
সিং	ছিং		
সিংহ	হিংগ		
চেতানো	চেতাইয়া		
কবিয়া	কইরা		
করেছ	করাইছ		
সই	সওলো		
কেন	ক্যান	কি লাইগা	
কি	কিতা, কিতাবে		
চোখ	চৌখ		
মাগী	মাউগ		
বসা	বইসা, বইস্যাগো		
চলা	চইল্যা, চল ল্যা		
বৌ	বউ		
গিন্নী	গিন্নাইন		
ভাগিনা	ভাইগনা		
ভাতিজা	ভাইস্তা		
কেঁদো	কাইন্দা		
মাথা	মাথ্যা		
কিনা	কিন্যা কিন্না		
মাথা	মাইথ্যা		
হয়েছে	অইছে		
সকল	হগল হকল		

ছড়া

ছড়া পূর্ব ময়মনসিংহের লোক-সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে এবং ছড়ার মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের লোক-মানুষের বৈশিষ্ট্য সমূহ বোঝা যায়।

পূর্ব ময়মনসিংহের ছড়া-সাহিত্যে আমরা যে একটি বিষয় লক্ষ্য করি ; তাহলো যে, ছড়ায় প্রাচীন মানুষের আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান সম্পর্কে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সূচিত।

ছড়ার ভেতর দিয়ে আমরা এখানকার লোক সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাসেরও পরিচয় পাই।

মানবজাতির সংগে প্রকৃতির সম্পর্কের চিরন্তন বাণী ও এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদীর অপরূপ বর্ণনা সমাজ বিরহ-ব্যথা, প্রেম, মায়া-মমতা, সুখ দুঃখ, আক্ষেপ, আশা-নিরাশা ভাল মন্দের এক সন্নিবেশ ছড়ায় অবলোকন করা যায়।

এখানে কতগুলো বিশিষ্টার্থক শব্দের ঝংকার, সুর, ছন্দ এবং বাকশৈলী পাওয়া যায় যা বিশেষভাবে আঞ্চলিক। এ জন্য পূর্ব ময়মনসিংহের ছড়া সাহিত্য স্বাতন্ত্র মর্যাদায়ও ভূষিত। কয়েকটি আঞ্চলিক শব্দশৈলীর নিদর্শন এখানে দেয়া হল।

'এ্যাত কল্ কল্' 'বাজার ঘট্ ঘট', 'চিতবাণী লাই'; 'ইছুন বিছুন', 'উকুনীর মালো জুকুনী', 'ক্যাশসুন্দর ভোমড়া', "আবসী ঘরের পরশীখানি, "পঞ্চপাখা মুখে ডাকা', 'ফুলের নাম তুলসী পাতা', 'আম পাতালে তুলসী', 'মামীর নাম রবসী', "বাকবাকুম বাক', 'সেমন্তলার ফুল ফুটে', 'কুতুব কুতুব ময়না', 'হেলিয়া ঢলিয়া পরে', 'ঝাঁকের উপরে ঝাঁক', 'ঝিলাকি টাডা টাডা', 'মেয়ের মাগো অরুণা', 'খালের কচ্ বিলের মাছ', 'আয় চাঁদ লড়িয়া', "মাঞ্জা চিকন কলসী কাঁখে', 'আমার দেশের সেরা পাতা' 'বারিন্দা লাগাইয়া', 'হেলান চেয়ারে বইয়া', 'ঝঙ্গি ঝিঙ্গি পুতুল', 'আমি কেন হেররে', 'সোনা তোর রূপের মালা', 'শাশুড়ি মণি পূজা করে', 'বউয়ের মাথায় রাঙা ফুল', 'বেণীতে তার গোলাপ ফুল', 'চাচী হাদে বুনী', 'সাদের

মেজমানী', উত্তুম গুত্তুম কইনা রাশি', 'ছাইবানুর চুলের অঁাশ', 'ধর্ম রাজার টিকি বান্', 'হুনছিলামনা হাতেগুতে, "উক ক্ষেতের পানি দিয়া' 'মাথা ঠাণ্ডা করে, "টেডি টেডি তেজ পাতা', 'ছইয়ার ভিতরে বইয়া রইছে', 'ফুইট্যা রইছে চাম্পা ফুল', 'বাক্-বাকুম', 'বেইন্যাবেলায়', 'বার চান্দের গুনাহ্ তার', ইত্যাদি।

রূপসী যুবতীর চুলের বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বড় বাড়ীর বড় ছেরী, মাথায় লম্বা চুল
কিলিপ দিয়া বানছে বেণী কানে দিছে দুল।
উত্তুম গুত্তুম কইনা রাশি
পান খাইয়া যা' ভালবাসি
পানের ডেডা কচু গাছ
ছাইবানুর চুলের অঁাশ।

মনের বেদনা ছড়ায় প্রকাশের ভাষা পেয়েছে।

"কত পোড়ো পুড়লোগো আল্লাহ্
পুড়ইয়া করলা ছাই
কার কাছে করবাম নালিশ
জগতে আর নাই।"

পান-সুপারী পল্লীগ্রামে যে শুধু প্রিয় এবং সৌখিন বস্তু তাই নয়--পানের সংগে প্রেমের এক অদ্ভুত সম্পর্ক আছে, সে পরিচয় প্রচলিত নীচের একটি ছড়ায় দেখা যায়।

পান দিলে সুপারী লাগে
আরো লাগে চুন
ঘুঁসিয়া ঘুঁসিয়া জলে
পীরিতের আগুন।

নেত্রকোণার কিছু অঞ্চলে ঘুঁসিয়া শব্দটির বদলে 'রসিয়া' শব্দটিও ব্যবহৃত বা শ্রুত হয়ে থাকে।

প্রেম যেমন একদিনের সাধনায় লাভ করা সম্ভব নয়, কিংবা এক তরফা হিসাবে প্রেমের গভীরতা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, তেমনি পানের সংগে চুনের এবং সুপারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটা ছাড়া অন্যটির ব্যবহার নিরর্থক, তাতে রস জমে উঠতে পারে না। রুচি পরিতৃপ্ত হয় না।

নদী, নারী, প্রকৃতি ও ফুল সবই এসেছে ছড়ার জগতে।

মেয়ের মাগো অরুণা
হল্‌দি মরিচ বাড় অন'
জামাই রইছে নদীর কুল
ফুইট্যা রইছে চাম্পাফুল
চাম্পা ফুলের গন্দে
জামাই আইয়ে আনন্দে।

নজরুলের একটি বিখ্যাত গান এখানে প্রাসংগিকভাবে স্মরণযোগ্য।

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি। ইত্যাদি।

এমনি ধরনের আনন্দ-বিরহ নিয়ে পুর্ব ময়মনসিংহে বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া আবহমান কাল ধরে চলে আসছে।

ছড়ার শ্রেণীবিভাগ

১। ক্রীড়া বিষয়ক ছড়া ঃ
(ক) বহির্বিষয়ক
(খ) অন্তর্বিষয়ক

২। মানসিক ছড়া ঃ
(ক) কৌতুকপ্রদ ছড়া
(খ) দুঃখবহ ছড়া

৩। শিশু মনোপযোগী ছড়া

৪। উচিতার্থক ও ধাঁধা বিষয়ক ছড়া

৫। ঘুম পাড়ানো ছড়া
৬। জামাই ঠকানো ছড়া
৭। সংসার বিষয়ক ছড়া
৮। বৈষয়িক ছড়া
৯। বিবিধ ছড়া।

ক্রীড়া বিষয়ক ছড়া

শুধুমাত্র পরিশ্রমকে ভিত্তি করেই একঘেয়েমীতে পল্লীজীবন অভ্যস্ত নয়, মনকে বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুক, হাস্যরসের দিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেও তারা পটু। হাডু-ডু, কপাটি, দারিয়াবান্ধা, গোল্লাছুট তাদের অতি প্রিয় খেলা যার ফলে তারা দেহকে শক্ত ও সতেজ করে তুলে। ব্যায়াম বলতে তারা সাধারণতঃ বিশেষ কিছু না বুঝলেও এসব যে আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত সে বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই দেখা যায় অবসর সময়ে তারা বিভিন্ন ক্রীড়াকৌতুকে মেতে থাকে। পল্লী মেয়েরাও প্রাত্যহিক কাজ সেরে কুডাখেলা, কড়ি খেলা আঙ্গুলের সাহায্যে খেলা প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকে। তারা যখন খেলার সংগে ছড়া কাটতে শুরু করে, মনে হয় যেন মুখ দিয়ে কোন মধুর গুঞ্জন উৎসারিত হচ্ছে। হেমন্তের রৌদ্র তাপকে তুচ্ছ করে কাপাটি খেলার ধুম পড়ে যায়, তখনকার ছড়াগুলি হলো ঃ

(১)

চল্ কপাটি বিন্দাবন
ঘড়ি বাজে ঠন্ ঠন্
ঘড়ির লাফে তউরাল[১] কাঁপে
তউরালের ঝিকিমিকি
বাওই[২] নাচে।
চল কপাটি
বেলতারা গুটি।

১ তউরাল—তলোয়ার, তরবারি ; ২ বাওই—একটি পাখির নাম।

(২)

ছিঃ ছিঃ কলার বোঁটা
রক্তমারি ফুটা ফুটা
বইস মারে লাথে
তোরাল কাঁপে
বড়ইর লেদা।
মারলাম ভেদা[১]।

(৩)

আমি গেলাম গৌরীপুর
দেইখ্যা আইলাম দুই চোর
দুই চোরে বেড়া ভাংগে
ধাপ্পুর ধুপ্পুর।

(৪)

কালী বাড়ীর মাডি
ছেলাম কইরা হাডি
যদি মাডি লড়বে
কিল খাইয়া মরবে।

(৫)

আমি যাইতাম ঢাকা
পথটা অইছে বাঁকা
উপুর বাডি[২] চাইয়া দেখলাম
আমের ঝাঁকা।

---

১ ভেদা—লাথি, ২ বাডি—দিকে।

(৬)

হাড্ডুম লাড্ডুম গুপ্তের লাই
মেরা গুডা ভাইজ্যা খাই
মেরা বলে হাম্মুব দুম্মুব
পবনে বলে যাই।

(৭)

উত্তরে দম, দম, পশ্চিমে সাগর
কালাঘোড়া ধবছে রাবন
রাবন ব্যাটা পানের বোঁটা
পান মানাইছে বড়ইর লেটা।

(৮)

গুডি গুডি তেলেংগা
তরে লইয়া গেলাম গা।
তারা মাঠে দুই ভাই
কপাটি কপাটি খেলে যাই।

উল্লিখিত ক্রীড়াবিষয়ক ছড়াগুলিকে গ্রাম্য ভাষায় 'দম,' বলে অভিহিত করা হয়। হাডুডু কিংবা 'বৌ বৌ' খেলা প্রভৃতিতে খেলোয়াড়গণ এক নিঃশ্বাসে এসব ছড়া কেটে যায়। বর্ষাকাল পল্লীবাসীদের অবসর নেওয়ার সময়। সে সময় দেখা যায় তারা মাটি কাদার মাঝে হাডুডু খেলে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এতে তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে থেকে শুরু করে তিরিশোর্ধরাও হাডুডু খেলে আনন্দ পায়। তবে শুধ বর্ষা-কাল নয় অন্য ঋতুতেও তারা হাডুডু খেলে। অনাবিল হাসিতে তারা ভেংগে পড়ে। খেলা ভাংগার পর তারা পানিতে ঝাঁপিয়ে পরে আর সাঁতার কাটে। হাডুডু খেলার ছড়া গুলো বেশ সুন্দর। আঞ্চলিক অর্থে

হাডুডু খেলাকে ডিগি-ডিগি বা ডুগ-ডুগ খেলা বলা হয়। এ খেলায় ব্যবহৃত কয়েকটি ছড়া নিম্নরূপ ঃ

(৯)

চল্ হাডুডু কলের ঘাডু[১] (২)
চল, হাডুডু··· ··।

(১০)

হাডু-ডু ভাইরে খামার বাড়ীতে যাইরে
খামারে না গড়াইছে নাও।
বাতা (৩) বাইয়া যাইরে
বাতার ঝন ঝন গুডি গুডি বাইংগন।

(১১)

ডিগ ডিগ এ্যাণ্ডা[২]
সাড়ে বারো গণ্ড'।

(১২)

এ্যাতাইয়ারে ব্যাতাইয়া'
লাউ পাতা চেতাইয়া'
কুমড়া পাতার ডুগ-ডুগ
খারে মাইনকার[৩] পুত।

(১৩)

অইয়ারে অইয়া বইয়া বইয়া
ডাহুকে ডাকে টক্ টকাইয়া
ডাহুকের মাথায় পাকা চুল
আয়রে সাধের গেন্ধা[৪] ফুল।

---

১. ঘাডু—ঘাটু দলের ছোকরা বা-নাচুনে ২. এ্যাণ্ডা—ডিম
৩. মাইনকার—নাম বিশেষ অথবা গালি অর্থে ব্যবহৃত ৪. গেন্দা—গাদা ফুল

(১৪)

আমি গেলাম পূবে
বাঁশ কাড়ি কুবে
বাঁশের নাই আগা
আমার নাম ডুইরা রাঘা

(১৫)

এতাংছি বেতাংছি
তেনা[১] পুড়া ঠ্যাং বানছি[২]
লোহা এ্যানছি দাড়ি
বাইছ্যা বাইছ্যা মারি।

(১৬)

ধান ক্ষেতে ফড়িং এর বাসা
ভেদা দিলে দেখতে তামসা।

মেয়েরা অনেক সময় 'বৌ বৌ' খেলে তৃপ্তি পায়। তাদের লঘু চপল হাসির মাধ্যমে তখন ফুটে ওঠে পল্লীর শান্ত রূপটি। বিভিন্ন মুখভংগিতে তারা ছড়া কাটতে থাকে উঠানের মধ্যেই জমে উঠে 'বৌ বৌ' খেলা। ছেলেরা যখন মাঠে কিংবা বাড়ীর বহির্ভাগে এ ধরনের খেলা করে তখন তাকে বলা হয় 'বন্দী'। এসব খেলার ছড়ায় অশ্লীলতাও বিগুমান। ছেলে ও মেয়েদের ছড়ার কিছু নমুনা দেয়া গেল।

(১৭)

আমি গেলাম বাজারে
পায় লাগল ধূলা
তোমরা তোমরা সাক্ষী থাইক্য
এইলা আমার পুলা[৩]।

---

১. তেনা—ন্যাকড়া ২. বানছি—বেঁধেছি, বন্ধন করেছি ৩. পুলা—ছেলে, পুত্র

(১৮)

ডাইলের মাঝে খেসারী

তোর মা আমার শ্বাশুড়ী

কলা গাছে লউ[১]

তোর বইন আমার বউ।

(১৯)

কলার গাছে বল্লার চাক

ভিইড়া[২] ভিইড়া বাপ ডাক।

(২০)

গাব গাছে কালী

তোর বোন আমার শালী।

(২১)

কলার ডাউগ্যা

বেড়া অইলে আউগ্যা[৩]।

মেয়েদের ছড়া

(২২)

হেতাইয়ারে হেতাইয়া

সানাইয়ারে ঢোল

লাম্পা তার বাইংগণ

চাম্পা তার ফুল।

---

১. লউ — লহু, রক্ত   ২. ভিইড়া — ভিড়িগা, কাছে আসিয়া

৩. আউগ্যা — আগা, এগিয়ে আয়

(২৩)

এ্যাত কল্ কল্
বেতের বাসা,
কাঠ কল কল
বোল্লার চুড়া।

(২৪)

বাজার ঘট ঘট
ঝি মাইর সাথী
বাইন্দা আনছি
জালর সাথী।

(২৫)

চিতরাণী লাই
কামার বাড়ীতে যাই
কামারে দিল দুধভাত
পেট ভইরা খাই।

(২৬)

এডি এডি গুইংগার পেডি
যে পাদ দিয়া মিছা কয়
তার পাছায় কুড়াল বয়
কুড়ালে বলে বাম বুত [১]
সদা বলে চারুত চুরুত।

এ পর্যন্ত যে সকল ছড়া আলোচিত হলো সে গুলো ঘরের বাইরে কিংবা মাঠে খেলার সময় আবৃত্তি করা হয়; কিন্তু পল্লীর লাজুক বধু থেকে শুরু

১. বামবুত—ধরনী বা শব্দ বিশেষ বুঝায়

করে ছোট ছোট মেয়েরা বর্ষার দিনে কিংবা অবসর মুহূর্তে যে সকল খেলায় অনর্গল ছড়া কেটে যায় তার মধ্যে কড়ি কুড়া দিয়ে খেলা, আংগুলের সাহায্য খেলা উল্লেখযোগ্য।

(অন্তর্বিষয়ক)

(২৭)

ইছুন বিছুন দাড়িকা বিছুন
মইষ পরে সোহাগ ভরে
কাপড় দিয়া চাউল কাড়ে
চাল কাড়ানি মাই গো
আমার দোষ নাই গো
মামা আইছেন ঘাইম্যা
ছাতি ধর লাইম্যা [১]
ছাতির উপরে কটরা
শ্যাম সুন্দর ভোমড়া [২]
(ফল)
এ্যালপাত বেলপাত তুইল্যা দিলাম ছিরি হাত [৩]।

(২৮)

উকুনীর মালো জুকুনী
ফুল টুকাইতে যাইবেনি
ফুলের নাম থইছে দেবী
আরশী ঘরের পরশী খানি
(ফল)
কও কাউয়া গুডি কার ডাইন।
রাজার গুড়ি রাজার ভাইন।

---

১. ঘাইম্যা—নামিয়া, নামিয়া, আসিয়া   ২. ভোমরা—ভ্রমরা
৩. ছিরি হাত—শ্রী হাত, সুন্দর হাত

(২৯)

(কোডা দ্বারা খেলা)

ফুলন-অ-ফুলন-অ-ফুলন-অটি
একটি হাতে জোড় ফুলন-অ

তেলন-অ

জামনঅ জামনঅ জামনঅটি
একটি হাতে জোড় জামন-অ।
সুষম সুষম সুষমটি
একটি হাতে জোড় সুষম।
কদম কদম কদমটি
একটি হাতে জোড় কদম।
বকুল বকুল বকুলটি
একটি হাতে জোড় বকুল।
তারজম, তারজম, তারজমটি
একটি হাতে জোড় তারজম(মুখ বন্ধকরণ)
লণ্ঠন লণ্ঠন লণ্ঠনটি
একটি হাতে জোড় লণ্ঠন।
কুটিলা কুটিলা কুটিলাটি
একটি হাতে জোড় কুটিলা।

(ফল)

পঞ্চপাখা মুখে ঢাকা
ছয়ে রেখা সাতে সালুক নাচে
আটে বান্দা ঘাটে[১]
নয় নব কোটা, দশে পরলো জোড়
এগারয় একটি বারয় সুতাটি

১· বান্দা ঘাটে—বাঁধানো ঘাটে

তেরয় তেসড়ি কাটা
চোদ্দয় রূপার বাঁটা
পনরয় পাশা খেলি
ষোলয় ঝাপটি তুলি
সতরয় সতর কেঞ্চি
আঠারয় বাঁশের কেঞ্চি
উনিশে একটি
বিশে তুলি ঝাপটি।

(৩০)

ইকিল মিকিল চাম চিকিল
চামের কুটুম বাদল দাস
নিয়ে হলো দামল দাস
ভাতে পড়লো মাছি কুদাল দিয়া চাঁছি
কুদাল অইল ভোতা
খেঁক শিয়লের মাথা।
(ফল)
এক এ ইন্দুর দুইয়ে দাতলা
তিনে তেলি চাইরে চোর
পাঁচ এ প্যাঁচা ছয়ে ছোঁছা
সাতে সাতু আট এ ঘাড়ু
নয়ে নৌকা দশে দাসী
বারয় বিয়া করি।

(৩১)

এই ঘরে কি, হেই ঘরে কি?
-হুকুন পোড়া
হুকুন কই?

·বিলাইয়ে নিছে
·বিলাই কই ?

জংগলে গ্যাছে
জংগল কই ?
পুইড়া গ্যাছে
পুড়া ছাই কই ?
গাঙে ভাইস্যা গেছে
গাঙের পানি কই ?
হুকাইয়া গেছে
হুকাইল গাঙের মাছ কই ?
চিলে খাইছে
চিল কই ?
ডালে বইছে
ডাল কই ?
ভাইংগা গেছে ।

(৩২)

ফুল ফুল টুকুনী
ফুলের নাম জুকুনী
ফুলের নাম তুলসী পাতা
সইয়ের নাম বনলতা ।

গাঁদা ও চাম্পা ফুলের কথা অনেকগুলো ছড়াতে পাওয়া যায় ; এতে মনে হয় যে, পল্লীবাসীরা ফুল-প্রিয় । বিশেষ করে এ ফুলকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে । নয়তো এমন মনপ্রাণ ঢেলে ছড়া আবৃত্তি করে ফুলের নাম উচ্চারণ করতো না ।

অন্তর্বিষয়ক ছড়া

অন্তর্বিষয়ক ছড়া বলতে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি, যে সকল অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখ-ব্যথা নিয়ে প্রকাশিত হয় সেগুলোই অন্তর্বিষয়ক। পল্লী-বাসীরা রসিক। রসের ভাণ্ড যেন তদের মুখে লুকিয়ে আছে। কোন বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা যে কোন উৎসবে তাদের আনন্দধারা প্রকাশিত হয় মুখের মধুর বুলি অর্থাৎ ছড়ার মাধ্যমে। কৌতুকের মাত্রাটা যখন বেড়ে যায় তখন আমরা দেখি কৌতুকপ্রদ ছড়া তারা আওড়িয়ে যাচ্ছে। হাসি-ঠাট্টার বান ডেকে যায়, ফলে মনে ভারি শান্তি অনুভূত হয়, সে শান্তি পল্লীর শান্তি, সে সুখ পল্লীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মনোবৃত্তি থেকে উৎসারিত, উদ্ভাবিত।

কৌতুকপ্রদ ছড়া

কৌতুকপ্রদ ছড়ার কয়েকটি নিদর্শন নিম্নরূপ :

বুর[১] কুনদা বুর
এক ছড়া কলা দিয়াম
বুর কুনদা বুর।

(২)

কাউয়া কাডল খাইতে চায়
বসন্তার মার হাতে কুডা
কাউয়ারে খেদায়[২]
কাউয়া[৩] কাডল খাইতে চায়।

(৩)

হ্যাং ছেঁড়া ভের ভেরা
কাডলের কোষ
তর মায় তরে মারছে
আমার কি দোষ ?

১· বুর—ডোবা ২· খেদায়—তাড়ায় ৩· কাউয়া—কাক

(৪)

আম পাতালো তুলসী

জাম পাতালো তুলসী

মামীর নাম রবসী

মামায় কাডে চিকন সুতা

মাম্যে রান্দে ভাত

কাইন্দ নাগো সোনা মামী

মামা তোমার বাপ।

(৫)

চিকা আইয়ে চিক চিকাইয়া

বাউন আইয়ে ঠ্যাংগা লইয়া

ধর চিকা মার চিকা

চিকার দাম পাঁচসিকা

হাত্যি আইয়ে লাথ্যি লইয়া

ঘোড়া আইয়ে সেলাম লইয়া

ধর চিকা মার চিকা

চিকার দাম পাঁচসিকা

(৬)

এক দুই তিন

কাইল[১] তোর বিয়ার দিন

(৭)

বড় বাড়ীর বড় ছেরি

মাথায় লম্বা চুল

কিলিপ দিয়া বানছে বেনী

কানে দিছে দুল।

১· কাইল—কাল

(৮)

হ্যাচ্ছেরিরে ধর
চুংগার ভিতর ভর
চুংগার ভিত্‌রে ভইর' তাবে
আমোদ পরমুদ[১] কর '

(৯)

আলু পাতার তালু তালু
ভেন্না পাতার দই
সকল জামাই খাইতে বইছে
গুদা জামাই কই ?
গুদা গেল মাছ ধরিতে
পাইল দুটি 'বাটা'
সকলরে বিলাইয়া দিল
গুদার কপালে ঝাঁটা
দিলি দিলি ঝাঁটার বাড়ী
তৈল দেলো ছান করি
ভাত দেলো খাই
পাটি খানি বিছাইয়া দেলো
গুদারে না চাই।
আয়রে সাধের পায়রাখানি
বাক্ব বাকুম বাক .

রাখালদের মধ্যে একজন দলপতি থাকে ওরা অন্য দলের গরুর পাল আটকিয়ে রেখে সে দলের রাখাল দলপতিকে খবর দেয় এবং নিম্নলিখিত ছড়াটি একদমে বলতে আদেশ করে। সেই দলপতি অর্থাৎ রাখাল রাজা অনুরূপ কাজ করে। এক নিঃশ্বাসে ছড়াটি না বলতে পারলে গরু কিংবা মেষের পালকে ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

---

১. পরমুদ—প্রমোদ

(১০)

এ'কাছি দু'কাছি তে'কাছি লাই

পালের ভাইয়ান[১] কইয়া যাই ;

দুধে ফুটে ; ক্ষীরে খাই ;

দুধ ফুটে লড়ে চড়ে

সাত রাউখ্যাল পইরা[২] মরে

সাত রাউখ্যাল এক লড়ি

আমি রাউখ্যাল এক লড়ি

আন লড়ি ডাক দিয়া।

ঘাড় ভাঙি পাক দিয়া

কাঁচা গুয়া আর মিডা পান

শুইন্যা যারে শালার পুত

পালের ভাইয়ান।

(১১)

পরাণ যায় ফাইট্যা

দুয়ার দিলাম খাইট্যা

আল্লা দেও বাইট্যা[৩]

আমার পেডে জুইট্যা।

(১২)

মরলাম মরলাম আমি

খিদার লাগি

এই দেশ ছাইড়া দিয়া

সক্কাল ভাগি।

পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় মানুষের মনও পরিবর্তিত হয়। হয়তো সে পরি-বর্তন হয় কোন হারানো ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে। পল্লী মায়ের জীবনে আসে বিয়োগান্তক পরিণতি। দুঃখবহ ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে এ পটভূমিতে। যেমন ঃ

---

১. ভাইয়ান—ভাইগণ ২. পইরা—পড়িয়া ৩. বাইট্যা—বাঁটিয়া

(১৩)

খবইরা,[১] খবর কয়
ছঘির চকিদার
তোমার দুইপুত মারা যায়
ভরসা কর কার ?

(১৪)

কি করিবে পুতের বউ
খদায় তোমারে দিছে
এমন দিন আমার আছিল
খদায় তারে নিছে ।

শিশু মনোপযোগী ছড়া

ছোটকাল থেকেই শিশুদের চোখে জাগে রংগিন নেশা :

পল্লী মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিয়ে সে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠতে থাকে । পল্লীর উদার মুক্ত বাতাস, বন-বনানীর সবুজ নেশা, পাপিয়ার পিউ পিউ, দোয়েলের মন মাতানো শিস, কোকিলের কুহুরব তার মনে প্রেরণার উৎস যোগায় আর সে আপন মনে হারানো ছড়াগুলো আয়ত্ত করে নিয়ে পাখির সুরের সংগে মিতালী পাতাতে চেষ্টা করে। শিশুদের মনোজগতে একটা আত্মভোলা মানুষ আছে যে মানুষটা সব সময় তার অবচেতন মনটাকে পাহারা দিয়ে রাখে। হয়তো সে জগৎ রোমাঞ্চকর। পৃথিবীর প্রতি কৌতুহল শিশুদের শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, শিশু হঠাৎ হাসছে, কাঁদছে। সে চিন্তা তার মনোজগতের গভীরে। প্রকৃতির প্রতিটি বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য বস্তর প্রতি তার কৌতুহল অসীম। সে বিশ্বাসের কোমল রেশ ছড়ায় বিদ্যমান।

১. খবইরা—খবরদাতা

পল্লীর তরুণীরা কিংবা ছোট বালিকারা সখিদের নিকট নিজেদের মনের গোপন কথা ফাঁস করে মনটাকে হালকা করে নেয় এবং সুন্দর ছড়া কেটে যায়।

ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সংগে আবেগ যখন মিশে তখন মিষ্টি এবং হৃদয়স্পর্শী আবেদন সে সব ছড়ায় সঞ্চারিত হয়। শীতে কাঁপুনীতে হৃদয়ের কথা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে তারা আনন্দ লাভ করে হয়তো শীতকে জয় করা যায় না কিন্তু আবৃত্তির মধ্যে যে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি রয়েছে তা স্বীকার্য।

(১)

জামাইবাবু কমলালেবু
একলা খাইওনা
দিদি আমার চেংড়া[১] মানুষ
কিছুই বুঝে না।

(২)

টকা[২] আমার সাথের ভাই
বড়ই ফালাও বাড়ীত যাই
টকা আমার কাকা
বড়ই ফালাও পাকা।

(৩)

ব্যাঙা ব্যাঙির বিয়া
ষোল্ল মডুক দিয়া
ব্যাঙা মেঘ লামা[৩] গিয়া

(৪)

ও পেনটু বায়স্কোপ
প্লেইট আনা বিবিয়ানা

১. চেংড়া—অবুঝ ২. টকা—এক ধরনের পাখী ৩. লামা—নামা

লাইডুম ঘরের বৈঠকখানা
রাজবাড়ীতে যাইতে পান্-সুপারী খাইতে।
পানের আগে মরিচ বাড়া
ইস্কুল ঘরের চাবি আড়া।

(৫)

ডুপিলো ডুপি ধান লাড়ছ কৈ।
চাইলতা গাছের মোড়ে
হাপের ল্যাংগুর লড়ে-চড়ে
বাঘে ডুক্কাইর মারে।
আজ ডুপির খেলা নেলা
কাল ডুপির বিয়া
ডুপিরে নিতে আছে
সেমন্তলা দিয়া।
সেমন্তলার ফুল ফুডে
থোকা থোকা অইয়া
ডুলিয়া ডোল বাজায়
বেতের শিশ দিয়া
সন্ন্যাসীরা পূজা করে
মইষের মাথ্যি দিয়া!

(৬)

প্যাঁচা তর প্যাঁচি কই?
বাচকি বুচকি তামসা কই?

(৭)

আড়ি কড়ি সীমার মাড়ি
বাপ-মা কুড়ি কুড়ি

কানি আংগুলের রক্ত
কিড়া আমার শক্ত।

(৮)

একজন কি ? ধ্বংস
খায় ঘোড়ার মাংস
চটা কি পিঠা
খায় আমার পা'টা

(৯)

বইনারি[১] লো বইনারি
হিংরা[২] তুলা যাইবেনি
হিংরায় মারল গালা
বইনারি আমার শালা।

(১০)

চিল, চিল কই যাইবে ?
আমতল্লাতে[৩] মনতলা যাইয়াম
কি মাছ খাইয়া ?
হউল[৪] মাছ খাইয়া
-কি বাঁশী বাজাইয়া
ভেলা বাঁশী বাজাইয়া।

(১১)

সাথী বইন সাথী বইন
আমার বাড়ীত যাইও
হাত ভইরা গুড় দিয়াম
চাইট্যা চাইট্যা খাইও।

---

১. বইনারি—সখি ২. হিংরা—পানীয় ফল ৩. আমতল্লাতে—আমতলা থেকে
৪. হউল—সোল মাছ

(১২)

সই গো সই
নাইল্যা ক্ষেতে বই
নাইল্যা ক্ষেতে বইয়া বইয়া
দুঃখের কথা কই।

(১৩)

আযলো বইন[1]
গকুলে যাই
ঘাসিলে ঘুঁসিলেনি
দন[2] খানি পাই।

(১৪)

বশি লো রশি
দুয়ার গোড়া
আমিও আসি।

(১৫)

বউয়ের চউখ্যের পাইন্যে
ভাত পরে
হগল ভাত
উৎলাইয়া পরে।

এক সখীর মনে কষ্টে অন্য সখী চুপ করে বসে থাকে না। তার মনেও দুঃখ কম হয়না, সেও বড় ব্যথিত হয়। সখীর দুঃখের স্বরূপটি ছড়ার মাধ্যমে অন্য সইয়ের মুখ দিয়ে বের হয়েছে। সইয়ের প্রাণের ব্যথা এত বেশী যে প্রাণকে উদ্বেল করে তুলে।

---

১. বইন—বোন ২. দন—ঝগড়া।

(১৬)

নড়ি[1] ডাকছ কারে
কড়ি দিলাম তরে
আমার ভাই সিয়ান[2] অইলে
বিয়া করাইয়াম তরে।

(১৭)

নউব্যা ছেঁাছা ধানের চেঁাচা
ধান ফালাইলে কতই চেঁাচা।

(পূর্ব ময়মনসিংহের ছড়া)

এ ছড়ার সৃষ্টি কাহিনী অত্যন্ত মজার। নউব্যা অর্থ্যাৎ নবকুমার নামে এক ব্যক্তির ছেলে পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতো। একদিন ওর সঙ্গে দলের সবার ঝগড়া হয়। তখন বিপক্ষের একটি ছেলে এ ছড়া মুখ দিয়ে বলতে থাকে। ছড়াটির অর্থ হল ছেলেটির বাবা নউব্যার কোন দাম নেই, সে ধানের মূলহীন চেঁাচার মতই অসার। এমনি করে ছেলেটিকে তারা অপমান করে।

(১৮)

বইদও উঠে মেঘও নামে
শিয়াল বেডা বিয়া করে।

(১৯)

ঠাকুর মেকুর[3] এগার
জাইত্যা থইলাম পাগার
পাগার গেল হুকাইয়া[4]
ঠাকুর রইল কিজাইয়া।[5]

১. নড়ি—নটী এখানে খারাপ অর্থে ব্যবহৃত ২. সিয়ান—বড় ৩. মেকুর—বেড়াল
৪. হুকাইয়া—শুকাইয়া ৫. কিজাইয়া মরিয়া।

(২০)

কুতুর কুতুর ময়না

বাপে দিল গয়না

মায় দিল পাড়ের শাড়ী

বইনে দিল ঠ্যাং-এ বাড়ী

যা তোর ল্যাংড়া[১]

হাইয়ের[২] বাড়ী।

(২১)

চিকারে চিক।

তর মার বিয়া

পান নাই সুপারী নাই

চোতরা পাতা দিয়া।

(২২)

শীত করে গো বুড়া বেডির

কাঁথা আইনা দেও

কাঁথার মধ্যে চিনা জুক

ফালাইয়া দে।

(২৩)

শীত মিত অগ্নি আমার ভাই

শীতের ডাইন[৩] কইও গিয়া

কাথা কাপড় নাই।

---

১. ল্যাংড়া—খোঁড়া ২. হাইয়ের—স্বামীর ৩. ডাইন—কাছে।

(২৪)

মউছ্যা রাংঙ্গা মাউছ্যা রাংঙ্গা

ঝাড়ু দিয়া যাও

কি বায়রে [১] ভাই ঝাড়ু দিয়াম

পুইট্যা [২] লাঙ্গল বাও[৩]।

পইট্যা লাঙ্গল বাইতে বাইতে

নাও গেল খালে

সেই নাও টাইন্যা আনলো

জমিদারের ঘাডে।

জমিদার জমিদার

কি কর বসিয়া

তোমার পুতে মাইর খায

দরবারে আসিযা।

আমতলার পানি ছুডে

জামতলায় যায

নগইরার পুলাপুরি[৪]

বাইছালি[৫] খেলায়।

বাইছালি খেলাইতে খেলাইতে

পথে পাইল শাডী

সেই শাডী লইয়া গেল

চন্দ্রার বাড়ী।

চন্দ্রার বাড়ীর পিছে

দুই জোড়া কইতর

হেলিয়া ঢলিয়া পড়ে

সভার ভিতর।

---

১. কি বায়রে—কোন্ভাবে ২. পুইট্যা—ছোট ৩. বাও—এখানে চালাও

৪. পুলাপুরি—ছেলেপুলে ৫. বাইছালি—নৌকা বাইছ দেয়া।

মায় বলে পুত্র পুত্র
ঝিয়ে বলে সোয়া।
আনিক্যারে [1] বরে বাপু
মিডা গাছের গুয়া
মিডা গাছের গুয়া খাইয়া
দাঁত কল কল করে
এক পয়সার সিঁদুর দিলে
কপাল বাইয়া পড়ে।

(২৫)

এই স্কুলে যাইতাম না
বেতের বাড়ী খাইতাম না
বেত গেল ভাঙ্গিয়া
মাষ্টার দিল কান্দিয়া।

(২৬)

ক, খ, গ,
বক মারিয়া ডুলিতে থ,
বক অইল কুইয়া [2]
মাষ্টার খায় চুইয়া চুইয়া।

(২৭)

মাষ্ট মশায় মাষ্ট মশায়
ছুডি দিলাইন না
আপনার বউ মইরা গেছে
খবর পাইলান না।

---

১. আনিক্যারে—ধ্যানে ২. কুইয়া —পচা বা পচিয়া গিয়াছে যা।

(২৮)

এই স্কুল সাদা
ছাত্রগুলি গাধা
বেঞ্চগুলি সরু সরু
মাষ্টারগুলি দামরা গরু।

(২৯)

এই ইস্কুল কালা
মাষ্টারগুলি ভালা
বেঞ্চগুলি তিন ফুট
ছাত্রগুলি ভেরি গুড।

(৩০)

লাইডা[১] মাথা পিয়ারী
ডিম পারে হরহরি
একটা ডিম নষ্ট
পিয়ারী মার কষ্ট।

(৩১)

শীত করে গো বুড়া মাই
কাঁথার তলে জায়গা নাই।

(৩২)

মাথা চিলা করকরি
আনডা পারে ভরভরি
একটা আনডা নষ্ট
বেপারী বেডার কষ্ট।

---

১. লাইড়া—ন্যাড়া।

(৩৩)

শকুনীলো শকুনী

একটু অষুধ দিবেনি

তর ছেরারে কবে ভাই

অষুধ না দিযে উপায় নাই,

দেরে ভাই আমারে

গরু দিলাম তোমারে।

(৩৪)

এই ছেরিলো এই ছেরি

হিংরা তুলা যাইবেনি

হিংরার মায় কইয়া দিছে

হাংগা[১] বইবেনি।

শিশু ছড়া আলোচনা করতে গিয়ে আমার ছোটকালের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। করুণা নামে এক লোকের পেছনে দেখতাম ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হন্যে হয়ে ছুটতে। ব্যাপারটা কি ? আমিও ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দিয়েছি এবং সবার সঙ্গে সুর করে নীচের ছড়াটি আবৃত্তিও করেছি :

রাধা নাথ সা'র লম্বা দাড়ি

করুণায় দেয় মাথায় বাড়ি।

বড় হয়ে জানতে পেরেছি যে এ ছড়ার একটা সুন্দর পটভূমি আছে। 'রাধানাথ' সাহা আমার দাদু। এক সময়ে তিনি বড় জোতদার ছিলেন। অর্থ বিত্তের ছিল তাঁর ঢালাও কারবার। সেই কারবারে এক সময় নাকি কী একটা অঘটন বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন করুণা নামে ঐ লোকটি। অন্য অর্থে রাধানাথ সাহা চৌধুরীর 'মাথায় বাড়ি' বসিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ এমন ক্ষতি সে করেছিল যার উপর ভিত্তি করে এ ছড়ার সূচনা। উল্লেখ্য, রাধানাথ

১. হাংগা—বিয়ে।

সাহার বেশ লম্বা দাড়ি ছিল। গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের কারো মুখে আবার শুনেছি যে, রাধানাথ বাবুর দাড়ি এত সুন্দর ছিল যে যা মনে রাখার মত, আর করুণা গ্রাম এলাকায় এমন সব কাণ্ডকীর্তি করে তাও আবাও মনে দাগ কাটার ব্যাপার, এই দ্বিমুখী বিষয়কে কেন্দ্র করেই নাকি উপরোক্ত ছড়ার জন্ম হয়েছে।

এ ছড়ার পরের অংশ হচ্ছে

ময়না সেনের বড় রাও
রাধাচরণের মুছে তাও
কাচনের চদর বদর
নেপাইল্যার ইশারা
ঝুলু সেনের কাম সারা।

উচিতার্থক ও ধাঁধা বিষয়ক ছড়া

উচিতার্থক ও ধাঁধা বিষয়ক ছড়াগুলি লোক সাহিত্যের এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। গ্রাম্য কথায় আছে 'উচিতের ভাত নাই'—ভাত থাক বা না থাক গ্রামীণ পরিবেশে এ সব ছড়ায় আবেদন যথেষ্ট।

জীবনের এক চেনা পথে তাদের যাত্রা, যেখানে সাফল্য আছে, শান্তি আছে, নিজস্ব একটি আসক্তিও হয়ত আছে। উচিতার্থক ছড়াগুলো সমাজ বিজ্ঞানীর নিকট সমাজ চেতনার কিছু অনুসন্ধান এনে দিতে পারে।

ছড়াগুলো দেখে অনেক সময় যেন মনে হয় পল্লীর আদিম মানুষ জন্মের বিকাশ থেকেই উচিত শ্রবণ ভালোবাসতো। এ ধারনা হয়ত অর্জন করেনি যে উচিত শ্রবণে অন্য কেউ বিব্রত ও বিরক্তি বোধ করতে পারে।

সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে তাদের মুখ খুলতো আর ছড়াগুলো সাবলীল ভাবে বের হয়ে আসতো। বৈচিত্র্যময় ছড়াগুলোর আবেদন চিরকালের এবং তা নির্ভুল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের বাস্তবতার মধ্যেও ছড়াগুলোর আবেদন নিঃশেষিত হয়নি। কে বা কারা ওগুলোর প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নাম জানা নাই, লেখা নেই কোন ইতিহাস। মানুষের

মনের অবরুদ্ধ কামনাগুলোর বাহ্যিক প্রকাশ আর বিকাশ এ ছড়াগুলো। কেউ তাঁর নাম লিখে রাখেনি, প্রয়োজনও বোধ করেনি বা হয়নি।

ধাঁধা বিষয়ক ছড়াগুলো চোখে মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। প্রহেলিকা সৃষ্টি এর অবহিত উদ্দেশ্য।

(১)

সিয়ানে[১] সিয়ানে কাডল খায়
বুলবুইল্যার[২] মুখে আইড্যা যায়।

—অর্থাৎ যে ধরেনা, ছুঁয়ওনা তার উপরেই দোষ পড়ে।

(২

সওয়াইদ্যা[৩] গাছের কাডল খাইয়া
নিত্যি আইয়ে ছালা লইয়া

—অথাৎ মানুষ 'বসতে পেলে শুতে চায়'-এর অনুরূপ।

(৩)

আপনে আপনে বড়
লঘ-ঘু অস্তি দড-অ[৪]।

—'আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়-এর মত এ ছড়াটির অথ।

(৪

ভাংগা ঘর উশ্শিলার পানি
রাইতে দিনে টিপ টিপানি।

—ভাঙ্গা ঘরে বাস করে যেমন শান্তি নেই তেমনি মানুষের একঘেঁয়েমি জীবনও মূল্যহীন।

---

১. সিয়ানে—সেয়ানা যে ২. বুলবুইল্যার—বুলবুলি-এক প্রকার পাখি
৩. সওয়াইদ্যা—স্বাদযুক্ত ৪. দড়-অ—শক্ত।

(৫)

নষ্ট নষ্ট এক—
যে ঘর লেইপ্যা
দুয়ারে থুয় প্যাক।

নষ্ট নষ্ট দুই—
যে ঘর ছাইয়া না ধরে টুঁই
যায় না বছর দুই।

নষ্ট নষ্ট তিন—
যে পরের কাছে করে ঋণ।

ন, নষ্ট চার—
যে ঘরেব কথা করে বাইব।

নষ্ট নষ্ট পাঁচ—
যে সীমে লাগায় বাঁশ।

নষ্ট নষ্ট ছয়—
যে পরের কথা লয়।

নষ্ট নষ্ট সাত—
যে পরেব থালে খায় ভাত।

নষ্ট নষ্ট আট—
যে পরের কথা করে রাষ্ট্র।

নষ্ট নষ্ট নয়—
যে স্ত্রীর কথায় কয় 'হয়'।

নষ্ট নষ্ট দশ—
যে স্ত্রীর হয় বশ।

গ্রাম-জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এ ছড়ার মধ্যে লক্ষ্যণীয়।

কালো কাজলের মাটি
তার লাগ ছয় মাস হাঁটি।
রাঙা ধুতুরার ফুল
তার নাই এক কড়ার 'মূল'।

এই ছড়াটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ধুতুরা ফুলের রং লাল; কিন্তু এর রস গন্ধ বলতে কিছু নেই। অন্যদিকে কাজল কালো হলে কি হবে তার একটা সৌন্দর্য রয়েছে যা আকর্ষণীয় এবং কদর রয়েছে অনেক। মোটামুটি এই হচ্ছে ছড়ার বাহ্যিক অর্থ। এই ছড়াটির উপমা এবং কালো ও লালের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধরা যাক, কোন মেয়ের গায়ের রং রক্তিম অথবা ফর্সা। কিন্তু সেটাই তার একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়, তার গুণ না থাকলে লাল ধুতুরা ফুলের মত তার অবস্থা হবে। সুন্দরের আসল বিচার হয় গুণে, রূপে নয়। রূপে চোখ জুড়াতে পারে কিন্তু গুণ না থাকলে মন ভরে না। "রূপে যদি মন না মজে সখি, সে রূপের মূল্য কি?" কবিতার পংক্তি মনে হয়ে যায়। অর্থাৎ রূপের সঙ্গে গুণের মিল চাই। এদিক থেকে কালো মেয়ের যদি গুণ থাকে অর্থাৎ কাজলের মত তার গুণগত মূল্য থাকে তাহলে কোন কোন অংশে সে সুন্দর মেয়ের তুলনায় কম আদরনীয় নয়। ছড়ায় নাটির মত প্রশান্তির সঙ্গে কালো মেয়ের তুলনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ছড়াটি রাগ অভিমান এবং ক্ষোভ প্রসঙ্গেও উচ্চারিত হয়।

(৭)

সাধলে জামাই খায়না
পায়ে ধইবাও পায়না।

মানুষের জীবনে এমন এক সময় এবং সুযোগ আসে যা অবহেলা বা অপরিণামদর্শিতার জন্য হারাতে হয়। কিন্তু সময় শেষে আবার ক্ষোভের দুঃখের বা আফসোসের আর সীমা থাকেনা।

(৮)

যার রান্না খাই নাই
সে বড় রান্দুনী।
যারে কোন দিন দেখি নাই
সে বড় সুন্দরী।

—অজানা অচেনা জিনিসের উদ্দেশ্যে এমনি কল্পনা বিস্তারের নিদর্শন এ ছড়াটি।

(৯)

আক্কেলে খাইয়া মাড়ি
বাপে পুতে কামলা খাড়ি

— ভাগ্যের ঘূর্ণিপাকে কিংবা নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অনেক সময় কষ্ট ভোগ করতে হয়।

(১০)

ভাল মন্দ যে না বাছে
তার ভাত হগল খানই আছে।

—সকল পরিবেশেই সামঞ্জস্য বিধান করে নেয়ার ফলে জীবন সত্যি-কার ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(১১)

হতাউ হউরী
পাট করিবে দেউরী।

—হতাই শাশুড়ী সংসারের শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের পথে অনেক সময় বিঘ্ন স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ঘরে বৌ থাকলে এবং স্বামীর বিমাতা বা সৎ শাশুড়ী থাকলে বৌকে বড় কষ্ট ভোগ করতে হয়।

(১২)

গাংগের পাড়ে তাল গাছ
তাতে করুয়ার বাসা
ছুডোর সংগে পীড়িত কইরা
পিডে তিনডা ঘষা

—সমানে সমানে কোলাকুলি বা সমানে সমানে বিরোধই শোভন। একজন সবল ব্যক্তির সঙ্গে একজন দুর্বল ব্যক্তির কিছুতেই শক্তির পরীক্ষা

চলতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনের একটি গভীর সত্য উপলব্ধি গ্রামীণ উপমায় কারুকার্যের মধ্য দিয়ে এ ছড়ায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। প্রেম করাও ঠিক তেমনিভাবে অনুচিৎ। অর্থাৎ রীতি মেনে প্রেম করাই ভাল।

(১৩)

নির্বুদ্ধিয়ারে বুদ্ধি দিয়া
বুদ্ধি করলাম ছন,
আনডা বাচ্ছা বেবাকতা বেইচা
বাসা করলাম বন।

—অনেক ক্ষেত্রে নির্বোধ ব্যক্তিকে বুঝাতে গেলে সে বিপরীত বুঝে। এর পরিণামে কুফল ভোগ করতে হয়।

(১৪)

ছিঁড়তে পারেনা মেষের বাল[1]
নাম কামাইছে শেখ জামাল।

—অনেক সময় দেখা যায় নামে আছে কিন্তু কাজ করতে অসমর্থ। এক্ষেত্রে নামের সঙ্গে কাজের কোন সংযোগ নেই। ছড়ার মধ্যে এভাবে অনামের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

(১৫)

মাব নাম কেতরী বান্দি
পুতের নাম সুলতান খাঁ।

—পরিবেশ পরিস্থিতি কিংবা অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে পুত্র হয়ে উঠতে পারে বংশের ব্যতিক্রম।

(১৬)

খাইয়া খাইয়া কানাই
ঝি বাঁচলে জামাই।

—ঝি থাকলেই তো জামাইয়ের আদর। ঝি না থাকলে জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটাই খুব খাটো হয়ে যায়।

---

১. বাল—চুল।

(১৭)

বান্দি কামে নাম নাই
পানি ভাতে গুণ নাই।

—সংসারের খুঁটি নাটি কাজ করার পেছনে বান্দি অর্থাৎ দাসীর তেমন নাম থাকেনা, এর সঙ্গে তুলনীয় পান্তা ভাতের যার কোন গুণ নেই। তেমনি ছোট ছোট কাজ করেও সহজে স্বীকৃতি পাওয়া যায়না।

(১৮)

জাতের মেয়ে কালাও ভাল
গাংগের পানি ঘুইল্যাও ভাল।

—বংশগত একটা সম্পর্ক অস্বীকার করা যায়না। উচ্চ বংশের বা জাতের লোকেরা স্বভাবতই ভাল থাকে।

এবারে ধাঁধা বিষয়ক ছড়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একজনকে ঠকিয়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করাই এ ধরনের ছড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য, এর চেয়ে অন্য কোন তাৎপর্য এতে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না।

(১)

উইড়া যায়রে পক্ষী
জুইড়া[১] লয় বিল
সোনার কটবা
রূপার খিল।

—এক প্রকার জাল।

(২)

এ্যাতেগড় টান দিলে বেতগড় লড়ে
কোক্কার [২]ডিমগুলি ভাইস্যা ভাইস্যা[৩] উড়ে

—ননী।

---

১. জুইড়া—জুড়িয়া ২ কোককা—এক প্রকার কালো পাখি ৩. ভাইস্যা—ভাসিয়া, ভেসে।

(৩)

ঝাঁকের উপরে ঝাঁক
তার উপরে কুলিন সাপ
কুলিন সাপে ডিম পাড়ে
গন্যানি[১] বড়াসতে[২] পারে।

—তারা।

(৪)

তিন তেরেঙ্গা তিন তেরেঙ্গা
গুডা মধু পাতা রাঙ্গা

—সিংরা।

(৫)

উঠান ঠন্ ঠন্
বৈঠক মাটি
মা গর্ভতী[৩]
পুতে ধরে ছাতি।

—কলার থৈড়।

(৬)

অতখানি বেডাডা দুধে ভাতে খায়
বড় বড় গাছের লগে যুদ্ধ করতে যায়।

—কুড়াল।

(৭)

রাজার বাড়ী মেনা গাই
মেন মেনাইয়া যায়
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া
আরও খাইতে চায়।

—পাটা শিল।

---

১. গন্যানি—গুনিয়া ২. বড়াসতে—কুলাতে ৩. গর্ভতী—গর্ভবতী।

(৮)

অতখানি গাছটা গুডা ধবে পাঁচটা
যদি গুডা লাল হয়
হাজার টাকার মাল হয়।

—কমলা।

(৯)

কলিকাতায় আগুন লাগছে
'নাসিরাবাদ' জানা গেছে
'গংগা' দিয়া ধুমা ছুটছে।

—হুকা, কলকী।

এখানে বলা আবশ্যক যে এ ধরনের ছড়ার আক্ষরিক অর্থ বিচার করে সমাধান বের করা ঠিক সম্ভব নয়। 'কলিকাতায়' বুঝাতে চায় কলিকা অর্থাৎ হুক্কার কলিকাতে আগুন লেগেছে। সেই আগুনের ধুয়া নাসিরাবাদ অর্থাৎ নারিচা দিয়ে নীচের অংশে প্রবেশ করে নির্গত হচ্ছে।

(১০)

চন চন চুনো খড়ি
রাইত পোহাইতেই
উজান বাড়ি [1]

—দরজা।

(১১)

আছিল খাড়া
কবছে কাইত
চিৎ। থূইছে সারা রাইত।

—দরজার খুঁটি।

এটা দিনের বেলা দরজার কাছে দাঁড় করে রাখা হয়।

---

১. বাড়ি—দিকে।

(১২)

এক বেইট্যে লাড়ে
আর দুই বেইট্যে মারে
মারতে মারতে চেপ্টা করে
—চিরাকুটা।

(১৩)

পাঁচ বেডায় তুইল্যা দেয়
বত্রিশ বেডার ঘাড়ে
আর বুইড়া লড় কইরা বেডা
টাইন্যা নিল ঘরে।
—জিহ্বা।

এখানে পাঁচ অর্থে পাঁচটি আঙ্গুল, বত্রিশ অর্থে দাঁত আর জিহ্বাকে বুড়ো হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

(১৪)

জাতার[১] উপরে জাতা
হাড়ুর উপরে ভর
কমরে কমরে ভিড়াইয়া আইন্যা
আন্‌জা[২] দিয়া ধর।
—কলসী।

(১৫)

চাইর কানি দিয়া গোল মূল
মধ্যে গাতা
লাম্বা দিয়া মারলাম জাতা।
—গাইল সেখাইট।

---

১. জাতা—চাপ ২. আন্‌জা—জাবড়িয়ে, ঝাপ্‌টে।

(১৬)

অতখানি আবুলা ভাত খায় খাবুলা
হগল মাইনসে খাইয়া যায়
তেও[1] ভাত রইয়া যায়।

—চুনের কৌটা।

(১৭)

উড়িতে ঝন্ ঝন্
পড়িতে ধান্দা
আধার খাইতে যায় পক্ষী
লেঙ্গুর তার বান্দা।

—জাল।

জালের দড়িটা হাতেই বাধা হয়।

(১৮)

হুতুম গুতুম ঘোড়ার ডিম
খাইতে মজা লাগে
আছাড় দিলে ভাঙ্গেনা
অনেক পূজায় লাগে।

—নারিকেল।

(১৯)

লড় বড় লড় বড়
ছেপ[2] দিয়া খাড়া কর
জোয়ানের একবার
বুড়ার বার বার।

—সুঁইতে সুঁতা পরানো।

বুড়োরা চোখে কম দেখে বলে তাদের হয়তো অনেকবারই লাগে।

---

১. তেও—তাতেও ২. ছেপ—থুথু।

(২০)

বন থাইক্যা বাইর অইল ভুইত্যা
পাতে দিল মুইত্যা
—লেবু।

(২১)

হরিণী ভাবনা মিছা
'নী' গেল চলিয়া
'দ্রাবক' আসিল বসিয়া
'বক' গেল উড়িয়া
আগে যে করিয়া রাখিয়া যতন
আইজ কাইল বেচতে পারে
অনেক টেকা মন।
—হরিদ্রা।

(২২)

হলদির চক্‌মক্ দুধের বর্ণ
এই সিলুক যে না ভাঙ্গাইতে পারে
তার মাউগের[১] পেডে জন্ম।
—ডিমের কুসুম।

(২৩)

উপরে কাম সিন্দুর
ভিতরে ছাই
এই সিলুক যে না ভাঙ্গায়
তার বাপ দা-ই
—মাখাল ফল।

---

১. মাউগের—স্ত্রীর।

(২৪)

একটু চুন কাম করা ঘর
ভাংতে গেলে সবার মনে
লাগে বড় ডর।
—ডিম।

(২৫)

মার নাম লেতি পেতি
পুতের নাম টেংগা
কইয়া দিলাম, ভাঙ্গা।
—শশা।

(২৬)

মামার বাড়ী গেলাম
খাইয়া গিয়া ফুইত্যা[১] রইলাম।
—বাঙ্গি।

খড় ছাড়া বাংগি ভাল হয় না। এটা এক প্রকার সুমিষ্ট ফল।

(২৭)

মামা মামি ছাইড়া যায়
একখান জিনিস থইয়া যায়।
—চোলা।

(২৮)

আইন্দার ঘরে লাইট্যা নাচে
তার কি আর আক্কেল আছে?
—পাখা।

---

১. ফুইত্যা—শুইযা।

(২৯)

মানজা চিকন কলসী কাঁখে
ঘাড় কইরাছ কাইত
শক্তে মারে চেপটা করে
ফুইল্যা উডে গায়।

—কামার।

এ ছড়াটির মধ্যে মনোরম কবিত্ব এবং চাতুর্য আছে। সমাজে এখনো প্রচলিত বিশ্বাস হল, বিবাহিত রমনীকে স্বামীর নাম করতে নেই, এতে অকল্যাণ হয়। এক সময় কেউ স্বামীর নাম উচ্চারণ করলে তা গুরুতর পাপ কর্ম বলে মনে করা হত। সে জন্যে অনেক ক্ষেত্রে ইশারা, ইংগিতে স্বামীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এতে একদিকে তাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে আবহমান পল্লীর সমাজ-চিত্রও এতে পরিস্ফুট। উল্লেখিত ছড়াটিই হল—কামারের স্ত্রী গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে; কাঁখে কলসী। তখন অন্য কেউ তাকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলো। স্বামীর নাম মুখে আনা সম্ভব নয়, সুতরাং সে এভাবেই ছড়ার মাধ্যমে জানাল, স্বামী তিনিই, যিনি শক্তে মারেন, অর্থাৎ হাতুড়ি দিয়ে লোহার উপরে আঘাত করেন, ফলে লোহা চেপ্টা হয়ে যায় অর্থাৎ ফুলে ওঠে।

বধুর পরিচয় এখানে, যে মানজা চিকন অর্থাৎ ক্ষীণাঙ্গী তন্বী।

(৩০)

উদারির উঠলে বুত[১]
আন্দা গোন্দা চিরা কুট।

—ঢেঁকি।

---

১. বুত—রাগ।

(৩১)

অতখানি দীঘিডা
কইয়ে উড়, উড়, করে
এমন বাপের পুত নাই
লাইম্যা কই ধরে।

—ভাতের ফেন।

(৩২)

নাড়ানুডা গাছটা
ডাক দিয়া আনে মানুষটা।

—ঢোল।

(৩৩)

ঘইস্যনাগো ঘইস্যন।
আমার পুতে আনছে উতি[১]
চিৎ করাইয়া দেখছিনা।

—বেহালা, যন্ত্র বিশেষ।

(৩৪)

কান্দে করিয়া নেয়
চিৎ করিয়া ফালায়
আছে বা না আছে
একখান হাতায়

—উচ, মাছ ধরার কল।

(৩৫)

দুই ঠ্যাং ছড়াইয়া
মধ্যে দিলাম বসাইয়া

১. উতি—হইতে।

কবিরত মিয়ায় কয়
অক্কই[১] জাতায় মাইমল্‌ত হয়
—যাঁতি, ডাল ভাংগার কল।

(৩৬)

ঝিলকি টাডা টাডা
ধান বুনিয়া আইলাম
আঠার কাডা
ফলে ধান পাকেনা
রাইত অইলে থাকে না।
—বাজার।

(৩৭)

নৌকায় ভ্রমরস মামা
তুমি যারে বিয়া করছিলা
তার ঘরের আমি
তোমার মা আমার ভগিনী।

(৩৮)

মানুষ গরু দেবতা
কোন্ গরুর বাইশ মাথা?

(৩৯)

গাছে করে মট্‌মট
কাউয়ায় করে কা', কি?
—(মট+কা)=মটকা।

(৪০)

এতখানি ডোবাডা
কইয়ে উর্‌ উর্‌ করে

---

১. অক্কই—একবারেই।

রাজা আইয়ে বাদশা আইয়ে
তুইল্যা সেলাম করে.

(৪১)

পানির তলে লোহার ঘর
দেখতে গেছিলাম
ছাড়লনা আইতাম।
—বাইর, মাছ ধরার কল।

(৪২)

ধরলে ধরা যায়না
ছুঁইলে ছোঁয়া যায়না
কাটলে কাডা যায়না
ছিঁড়তে গেলে ছিঁড়া যায়না।
—ছায়া।

(৪৩)

নামে আছে কাজে নাই
এর নাম কি ?
—ঘোড়ার ডিম।

(৪৪)

তিন তের দিয়া বার
নয় দিয়া পূরণ কর।
—ষাইডা।

তেরকে তিন দিয়ে গুণ=৩৯, এর সংগে ১২ যোগ=৫১, এর সংগে ৯ দিয়ে পূরণ (পূর্ণ) করা=ষাট।

ষাইডা একজন লোকের নাম। প্রশ্নকর্তার জবাবে পল্লী বধুর বুদ্ধির পরিচায়ক এই ছড়া। কারণ স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে মানা।

ঘুম পাড়ানো ছড়া

ঘুম পাড়ানো ছড়ার মধ্য দিয়ে আপনাকে জানা এবং তা প্রকাশ করার ইচ্ছা নিজকে ক্রমশঃ পেয়ে বসে। ঘুম পাড়ানি মাসি এসে যেন শিশুর চোখে ঘুমের আমেজ দিয়ে যায়, গল্প আর ছড়া শুনতে শুনতে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। গুরুজন স্থানীয়রা শিশুকে একবার চাঁদের দিকে দৃষ্টি তুলে দেবার চেষ্টা করেন, হয়তো অনেক সময় বুকে জড়িয়ে ধরে রাক্ষুসদের গল্প বলে যান। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের মনোজগৎ একটা অপূর্ব সৃষ্টি, সামগ্রিক চেতনার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। শিশুরা সাধারণ ব্যাপারে ভয় পায়, আবার এমন শিশু আছে যারা ঠিক এর উল্টো। চাঁদকে দেখে শিশুর প্রশ্নের অন্ত নেই, চাঁদের আলো শিশুর কাছে বড় ভাল লাগে। এমন কি সে দুহাত দিয়ে চাঁদকে হয়ত আহ্বান জানাতে শুরু করে। মা তখন চাঁদকে ডাকেন ঃ

"ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি
মোদের বাড়ী এসো
খাট নাই পালঙ নাই
খোকার চোখে বসো।"

এমনি ভাবে মা শিশুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেন, মনকে ভোলাবার জন্য কত রকমের ছড়া কেটে যান।

(১)

লইল্যারে[১] লইল্যা
কিরে লইল্যা
আজ লইল্যার পেরিবান

---

১. লইল্যা—ললিত, একজনের নাম।

ছাগল বান্দার দড়ি আন
চড়কা কাটার মাল আন
লইল্যা ঘুমাইরে।

(২)

তোরা কে যাওরে
গাঙে বইডা বাইয়া
আবুর মামারে কইও
নাইওর নিত আইয়া
থাক ভাগ্নি থাক ভাইগনা
কিল মুড়া খাইয়া
আষাঢ় মাসে নিয়াম আইয়া
লাল পানসি দৌড়াইয়া
আষাঢ় মাসের কাঁচা চিড়া
বিন্নি ধানের খৈ
নাজির পুরের সবরি কলা
গামছা বান্ধা দই।

(৩)

লইল্যারে লইল্যা কিরে লইল্যা
কই যাস রে লইল্যা ?
—মামার বাড়ীত
—নায়[১] না তরে ?
—জুঁকে ধরে
-জুঁক ফালাস কই ?
—ধান ক্ষেতে
—ধান কেমত ?
ছড়া ছড়া

১. নায়—নৌকায়, নৌ-পথে ২. তরে— হেঁটে।

চাউল কেমত ?
—হউলের পনা ।
—তরে অত ভাতে মরা দেখা যায় কেরে ?
তর বউয়ে ভাত দেয় না ?
তর বউরে মারতে পারস না ?
—দুইটি ছেলে কান্দে যে ।
—ছেলের নাম কি ?
—ধনাই পনাই
—তর নাম কি ?
সূর্য কানাই
—তর বউয়ের নাম কি ?
—চতুর্দ্দশী
—তর হউরীর নাম কি ?
—পেরী গাই
—তরে লইয়া তবলা বাজাই ।

(৪)

আমরার আবু ঘুমায়রে
খান বাহাদুরের ছায়
আম কাডল পাইক্যা রইছে
ডালে বইয়া খায় ।
ডাল গেল ভাইংগা
তেলী বাড়ীত যাও
তেলী দিল তেল কাড়ানি
মাইয়ে দিল ফুল
উন্দুর রাজার বিয়ার সময়
চিকায় বাজায় ঢোল
চিকা আইয়ে চিক চিকাইয়া

মাকড় আইয়ে খাইয়া
সিলট্যা বামুন আইয়ে
সারিন্দা বাজাইয়া ।

(৫)

আবু ঘুমায়রে
খালের কচু খাইয়া
খালের কচু বিলের মাছ
ধইবা আনতো গিবা
আবু ঘুমাইরে ।

(৬)

আয চাঁদ লড়িযা
কলা গাছে চড়িযা
কলা অইছে বাত্যি[1]
আবুর কপালে ছাতি

(৭)

আবু কেবে কান্তরে[2]
হলদি ক্ষেতে বইয়া
তিনডা ডুহি[3] মইরা রইছে
আবুব নিশান লইয়া ।

(৮)

আবু নারে নারে
ধনু গাঙের পারে
আব্ করিয়া ডাক দিলে
উইরা আইয়া পরে ।

---

১ বাত্যি—পাকার অবস্থা, পরিপক্ক । ২. কান্তার—কান্দেরে ।
৩. ডুহি—এক ধবনের পাখি, ডুপি ।

জামাই ঠকানো ছড়া

আমাদের দেশের পল্লীর অনুষ্ঠানগুলো বিশেষতঃ বিবাহ উৎসব প্রত্যেক মানুষের মনে আনন্দের খোরাক জোগায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ উৎসবে বিভিন্ন রঙ্গ কৌতুকের আভাস পাওয়া যায়। তখন মেয়েরা গান গায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন বরকে ঠকাবার জন্য নানা প্রকার ছড়া আবৃত্তি কিংবা ধাঁধা প্রয়োগ করে বরকে বিব্রত করে তোলা হয়। এগুলোকে বর বা জামাই ঠকানো ছড়া বলা যেতে পারে। তাই বরকেও উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্ন হতে হয়। যখন শ্যালক শ্যালিকা জামাইয়ের কাপড় টানতে শুরু করে তখন সে নীচের ছড়া বলে থাকে :

(১)

মায় দিছে আনাইয়া
যোগ্যী দিছে টানাইয়া
যোগ্যীর পুত গাবর
ছাইড়া দে আমার কাপড়।

খেতে বসলেও জামাই বাবুর শান্তি নেই। তখন হয়তো কোন রসিক ছেলে মেয়ে বলে উঠতে পারে –

(২)

পিঁড়ির নাই আগাগুড়ি
পিঁড়ির নাই বাও
পিঁড়ির উপরে গুরুর চরণ
কেমনে তুলবাইন পাও।

তখন জামাইবাবু বাধ্য হয়ে এ ছড়ার সমস্যা সমাধানের পথ বের করে নেন। বোকা বরের পক্ষে ছড়া ভাঙ্গানো সম্ভবই নয় উপরন্তু তিনি হয়তো পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন জামাইবাবু প্রতিউত্তর সহজেই দিয়ে ফেলেন ঃ

(৩)

পিঁড়ির আছে আগাগুড়ি
পিঁড়ির আছে বাও
গুরুর চরণ শিরে[১] থুইয়া
পরে তুলবাম পাও।

তারপর আবার মুখ ধুতে গিয়েও জামাইবাবু মুশকিলে পড়লেন। যখন তিনি পানির গ্লাসটা হাতে নিলেন তখনই কোন ঠাট্টার পাত্র পাত্রী বলে বসেন ঃ

(৪)

গাঙে অইছে গোমাবী[২]
কলসে অইছে দই
খাইছইন জামাই
আচাইবেন কই ?

তখন বাধ্য হয়েই আবার প্রতি জবাবে ছড়া কেটে ফেলে জামাই ঃ

(৫)

রামে দিছে দীঘি
লক্ষ্মণে দিছে সুত[৩]
সেই ঘাডে আচাইবাম[৪]
আমার মুখ

এ ছাড়া কোন সময় শ্বশুর বাড়ীর দরজার কাছে কাপড় টাঙানো থাকে। জামাইকে সে পথ দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতে হয়। হয়তো কোন মান্য-

১ শীরে—মাথায় ২ গোমাবী—মড়ব ৩ সুত—স্রোত ৪. আচাইবাম—মুখ ধুবো।

গণ্য ব্যক্তির কাপড় টাঙানো রয়েছে এই ভেবে জামাইবাবুর মাথায় বুদ্ধি খেলতে থাকে ; তিনি অনায়াসে বলে ফেলেন ঃ

(৬)

আয়রে পবনের বাও
যার কাপড় তার গাও

জামাইবাবুর নতুন দাদী শ্বাশুড়ীও কম বুদ্ধিমতী নন। তিনি কাচা মরিচ এনে জামাইকে ভাঙ্গতে বলেন।

তখন জামাই কিছুটা বোকা বনে যায়। জামাই উত্তর দেয়—

আসমান থাইক্যা পড়লো তীর
মরিচ অইল তিন চির।

শুধু জামাইকে কেন, জামাইয়ের ছোট ভাইকে বেয়ান বিয়ানরা অস্বাভাবিক রূপে পরাস্ত ও অপ্রস্তুত কিংবা পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করে।

(৭)

ধর শালারে ধর শালারে
দৌড়াইয়া ধর।
ডাইন হাতে ধর শালারে
বাম হাতে চড়।
তর দেশে গ্যাছলামরে শালা
পানের ব্যাপার নাই
আমার দেশের মেরা পাতা
শালারে খাওয়াই।
ব' শালা ক' কথা
খা' বাডার পান
উইঠ্যা যদি যাইবে শালা
মলবাম তোর কান।

উইঠ্যা—উঠে।

তর দেশে গ্যাছলাম শালা
গুয়ার ব্যাপার নাই
আমার দেশের মেয়া গুড়া
শালারে খাওয়াই ।
তর দেশে গ্যাছলামরে শালা
গোল্লার ব্যাপার নাই
আমার দেশের ঘোড়ার লেদা[1]
শালারে খাওয়াই ।

সংসার বিষয়ক ছড়া

লোক সাহিত্যের বিশেষ এক অংশ সংসার বিষয়ক আঞ্চলিক ছড়া। বিস্মৃত অতীত থেকেই বাস্তব জীবনের সংগে ছড়া নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে চলে আসছে। পল্লী জীবনে এসব ছড়ার আবেদন একান্ত অন্তরঙ্গ। জীবনের কোন পর্যায়ই এসব ছড়ার সংগে প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কহীন নয়। পল্লী জীবন একান্তভাবেই অনায়াসসৃষ্ট, লোকজ মানুষও পল্লীর শ্যামল পরশে মুগ্ধ। আস্তে আস্তে মানুষ উন্নতি ও প্রগতির পথে পা বাড়ালো। ফলে নগর সৃষ্টি হল এবং নগরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো নাগরিক সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং রঙের মোহ পল্লী জীবনকে শহরমুখী করে তুলেছে। সংগে সংগে লোক সাহিত্যের অবয়বেও নাগরিকতার স্পর্শ লেগেছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলকে বিশেষভাবে অক্ষয় লোক সাহিত্যের ভাণ্ডার বলা যায়। ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেছে। তা'ছাড়া জনাব সিরাজ উদ্দিন কাসিমপুরী 'লোক সাহিত্যে ছড়া' নামক গ্রন্থে পূর্ব ময়মনসিংহ যে ছড়ার রাজ্যে এক অমৃত ভাণ্ডার তার প্রমাণ রয়েছে। সংসার জীবনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এলাকার গ্রামে গঞ্জে বহু ছড়া প্রচলিত রয়েছে।

---

১. লেদা—বিষ্ঠা।

সাজানো সংসারে কখনো আগুণ জলে উঠে, বৌ, ঝি, শাশুড়ী ও পুত্রের দ্বন্দ্বে ও কলহে।

সংসার বিষয়ক ছড়াগুলো আজও আলোচ্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। নিতান্ত স্বাভাবিক হলেও ছড়াগুলোতে বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। পল্লীর বৌ যেমন শাশুড়ী সম্পর্কে নানা কুৎসা বাড়ী বাড়ী ছড়িয়ে দেয় তেমনি শাশুড়ীও বৌ-এর কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। গ্রামের রমণীরা এমনিতে শান্ত সরল কিন্তু তারা ছোট খাট কানা ঘোষা কথাও ধরে ফেলে, এর মধ্য দিয়ে তাদের আসল রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েকটি ছড়ার বর্ণনা এখানে দেয়া হল। এই সকল ছড়াকে বিদ্রুপাত্মক বা নিন্দা সূচক ছড়া বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। মুখ্যতঃ একের মন্দ বা নিন্দা অর্থাৎ বৌ শাশুড়ীর নিন্দা, শাশুরী বৌয়ের নিন্দা, স্ত্রীর প্রাধান্য ইত্যাদি ব্যক্ত হয়েছে এ সব ছড়ায়।

(১)

কলির এই ব্যবহার
মা বাপের ভাত নাই
বউয়ের অলঙ্কার
মা করে চিড়া বাড়া
ভাংগা ঘরে বইয়া
বউয়ে করে লেদাপড়া[১]
হেলান চেয়ারে বইয়া
মা পিন্দে চিড়া কাপড়
গির-অ গার-অ দিয়া
বউয়ে পিন্দে নানান শাড়ী
বারিন্দা লাগাইয়া।

---

১. লেদাপড়া -লেখাপড়া, ব্যঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত

নায় খায় পানি ভাত
হুকুন পোড়া দিয়া
বউয়ে খ য় গরম ভাত
সবরি কলা দিয়া।
বুড়ায় কয় বুড়ী লো তুই
দেখছনা লো চাইয়া
বউ যায় তার বাপের বাড়ীত
তর পুতেরে লইয়া

২

কলিতে বৌ ঝিয়েরে এখন
অধিক মন্দ বলা যায় না ।।
পিঁড়ি ধওনের সময় আইলে
শ্বাশুড়ী জিজ্ঞাসা করে ঃ
-বৌগো তুমি পিঁড়ি ধওনা ?
-ওঃ ঠাকুরাইন বাসি পানিতে হাত দিলে
ঠাণ্ডায় প্রাণ বাঁচিবে না ।।
উডান ছিড়ার সময় আইলে
শ্বাশড়ী জিজ্ঞাসা করে ঃ
-বউ গো তুমি উডান ছিডা দেওনা ?
—ওঃ ঠাকুরাইন বাসি গোবরে হাত দিলে
দুর্গন্ধে প্রাণ বাঁচিবে না ।।
বাসুন ধওয়ার সময় আইলে
শ্বাশুড়ী জিজ্ঞাসা করে ঃ
—বউ গো তুমি বাসুন ধওনা ?
—চোকা ছাড়া বাসুন মাজলে,
বাসুন তো সাফ [১] হইবে না ।।

---

১. সাফ—পরিষ্কার

ঘর লেপনের সময় আইলে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করে :

—বউগো তুমি ঘর লেপ না ?

—ওঃ ঠাকুরাইন করলে করব

না করলে নাই দাসী কাম আর করিব না ॥

পাক করনের সময় আইলে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করে :

—বউ গো তুমি পাক কর না?

—ও ঠাকুরাইন করলে করব, না করলে নাই

তোমার বাপের ধার ধারি না ॥

অনেক সময় মার চেয়ে সংসারে ছেলে যেন বউকে বেশ দরকারী ও প্রিয় মনে করে, তাই বউয়ের প্রাধান্য এখানে পরিস্ফুট। এ ধরণের ছড়া সুরারোপের ফলে গানও রূপায়িত হয় এবং বিশেষ করে গ্রামের বৃদ্ধা মহিলারা সাধারণতঃ গেয়ে থাকে।

(৩)

মাগো তোমার কপাল ভালা

বৌ পাইয়াছ স্বর্গের তারা ॥

মাছের মধ্যে আছে রউ

ঘরের মধ্যে পুতের বউ

তার তুল্য[১] আর কেহই নাই ॥

ঠোঁট মুছুরা মুখ মুছুরি

সবাই কইও বউয়ের ভালা ॥

সারাদিন কাম কইরা আমি

বউয়ের মুখে হাসি দেখি

সকল কামের জালা যায় দূরে

তাই আমারে কান মন্ত্র দেয়

মায় নামেতে পাইতলা[২] ফালা ॥

---

১. তুল্য—তুলনা ২. পাইতলা—পাতিল

—স্বামীর মুখে স্ত্রীর গুণ শুনে মা চুপ করে বসে থাকেন। বউয়ের অসুস্থ অবস্থা শুনে তার মা-বাবা মেয়েকে দেখতে বেয়াই বাড়ীতে ছুটে আসেন। তখন আবার হয়ত বউ অকপটে স্বামীর নিন্দা করে ছড়া আবৃত্তি করে। মা-বাবা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেন।

(৪)

মেয়ে ঃ মইলাম মইলাম গো
মাইয়া, মাথার বিষে ;
সর্বনাশ্যা কপাল পোড়া
মাথায় বাড়ি দিছে।
মা ঃ কিয়ের লাইগ্যা মারছে গো ঝি
কিয়ের লাইগ্যা মারছে ?
মেয়েঃ আধা পইসার কেছলি মাছ
বিলাইয়ে যে খাইছে।
বাবাঃ কি দিয়া মারছে গো ঝি
কি দিয়া মারছে ?
মেয়ে ঃ বউরা বাঁশের গুড়ি দিয়া
মাথায় বাড়ি[১] দিছে।
যাইয়াম-যাইয়ামরে, ল্যাংন্দ্রা,
বাপের বাড়ী
আন বার বেলা বোঝা যাইবে
পায় ধরা ধরি ॥

(৫)

পনা রান্দিয়া দে
তুই না রান্দিলে পনা
রাইন্দা দিবে কে ?

---

১. বাড়ি—আঘাত করা

উইচ[1] দিয়া মারে পনা
চালুন দিয়া ধয়
কড়াইতে ফালাইয়া পনা
লাইড়া চাইড়া লয়।
পুলার বাপ খাইতে বইছে
পনা নাই কড়াইতে
হাত খাইন ঝাইডা দিল
পুলার বাপের পাতে।
উম্মুরিয়া মারে কিল
গুম্মুরিয়া উডে
পাড়ার লোকে উইট্যা কয়
পর্বেব চিরা কুডে।
মারছ মারছ পুলার বাপ
যাইয়াম বাপের বাড়ী
আননের বেলায় বোঝা যাইবে
পায় ধরাধরি ॥

(৬)

দুয়ারে দুয়ারে যায় রে বুড়ী
পাড়ায় পাড়ায় যায়
সকল নিন্দা থুইয়া বুড়ি
বউয়ের নিন্দা গায়।

বউ ঃ

মইলনারে মাইল্যা বুড়ি
পাইড়া দিতাম মাডি
মুখে দিয়া ভইরা দিতাম
বউরা বাঁশের গুড়ি।

---

১. উইচ—মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ বা কল।

এমত বুড়ি দেখছি ন' গো
যমে থইয়া যায়।
আমার লাইগ্যা বান্দর মুখী
লেখছে বিধাতায়।
আমার সোয়ামী বাড়ীতে আইলে
কার বা কিবা করে
হাট কুন্নিয়ার[১] চউখ্যে যেন
মরিচ ভাইঙ্গা পরে॥

(৭)

বউ না বউ
অরণের[২] ডাকুনী
দিনে অইলে মানুষ
রাইতে অইলে রাধুনী

(৮)

মাগো মা বউয়ের নিন্দা বলিও না
বউরে যদি মন্দ বল
আমার মন তো পাবে না॥
হাডে যাই বাজারে যাই
বউযের ভাগ্যে জিত্যাই[৩]
বউয়ের ভাগ্যে দালান কোডা
মায়ের ভাগ্যে কিছুই নাই।
বাথান ভরা মইষ আছে
হাত্যি আছে ঘোড়া আছে
সবই আছে বউয়ের ভাগ্যে।

১. হাটকুন্নিয়া—গালি বিশেষ ২. অরনের—অরন্যের
৩. জিত্যাই—জয়লাভ করি, লাভবান হই।

(৯)

বউয়ে করে ভাজা বড়া
হউরিরে দেয় থুড়া থুড়া

শ্বাশুড়ী ঃ বউ গো তুমি ল্যানজা দিলানা!

বউ ঃ ল্যানজা নিছে বিলাইয়ে
ধর-অ ক্যান-অ আমারে
দারুন বিলাই ধরতে পারলাম না

(১০)

মায়ে রান্দে তিতা তিতা
বইনে রান্দে পোড়া ছাই
লীলা রান্দে খাসা মুগের ডাইল।
মার শাড়ি তিন টাকা
বইনের শাড়ি পাঁচ টাকা
লীলার শাড়ি এক শ' পাঁচ টাকা।
মায়ে পিইন্দা ঘরে যায়
বইনে পিইন্দা নাইওর যায়
লীলা পিইন্দা শহরে বেড়ায়।

এ গুলোতে এক দিকে যেমন পল্লীর স্নিগ্ধশ্রী শ্যামলতা দীপ্যমান, তেমনি নগর জীবনের মৃদু আহ্বানে জীবনের কোন কোন অংশের বিপর্যয়ও পরিস্ফুট।

বৈষয়িক ছড়া

দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড যেকোন বিষয় নিয়ে যখন ছড়ার সৃষ্টি হয়, সে গুলোকে বৈষয়িক বা পাঁচমিশালী ছড়া বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হলো মাছ ধরা বা মাছ বিষয়ক

ছড়া, পালা-পার্বনের ছড়া ইত্যাদি। জেলেরাতো মাছ ধরেই, তাছাড়া গ্রামের অনেকলোকও মৌসুমে মাছ ধরে আনন্দ লাভ করে এবং ধরার সময় বিভিন্ন রসালো ছড়া আবৃত্তি করে। কৌতুকোদ্দীপক হলে মাছকে বড়শীতে আটকাবার জন্যেও ছড়ার ব্যবহার রয়েছে।

(১)

আছলাম[১] পাতালে
তুলছে খইর করে
নিবে গা তোমারে।

(২)

হরিংগি লো হরিংগি
কে দিল তরে ছিরিংগি
যে দিল আমারে ছিরিংগি
হে গ্যাছে ঘর
আমি যদি মরি
তুই আইয়া ধর।

বর্ণিত ছড়া দুটো মনে হয় যেন মাছের মুখ দিয়েই বেরিয়ে এসেছে। মাছ কি বড়শীতে বিধবার আগেই জানতো যে সে ধরা পড়ে জীবন বিসর্জন দেবে, তাহলে তার এত সতর্কতা অবলম্বন করার কিইবা প্রয়োজন থাকতে পারে ?

(৩)

বড়শী বায় বড়শী বায়
লোহার ট্যাঙর

---

১. আছলাম—ছিলাম

এই বড়শীতে মাছ ধরলে
মুখ পোড়া বান্দর।

(৪)

ঐতরি দুইতরি কইতরি ভাজা
বাংলা মাছে ধরছে কাজা
ইচা মাছের ঘাড়ে তেল
ধইতে ধইতে পরান গেল।

(৫)

আমি গেলাম নাইন্যা[১]
মাছে ধরে টাইন্যা
মামার বাড়ীর সবরীকলা
টপ্যাত্যা গিইল্যা ফালা।

(৬)

ঐয়া রাণী বইয়া খায়
গুইংগা রাণী সাজে
সাত হাত মাগুরের কাডা
ঝুম্মুর ঝুম্মুর বাঁজে।

(৭)

আমি কেন হেররে[২]
পল দিয়া বের হ'রে
পলর[৩] চাপে, গুন গুন ডাকে।

---

১. নাইন্যা—নানিয়া, একটি গ্রামের নাম ২. হেররে—হারিয়া যাই
৩. পলর—মাছ ধরার এক ধরনের যন্ত্র

(৮)

ঝিঙ্গি ঝিঙ্গি পুরল[১] মাছ
মামায় আনলো গইন্যা মাছ
গইন্যা[২] মাছ নিল চিলে।
ও ঃ চিল বিলে যায়
গুইংগা[৩] কাডা টুইক্যা[৪] খায়
মামার হউরির[৫] মাকে দাও
পোক[৬] ফালাইয়া বাইছ্যা খাও।

হিন্দুদের মাঘি-ব্রতের সময় ছোট বড় ছেলে মেয়েরা রাতের বেলায় পাত্র হাতে নিয়ে বাঘের সিন্নি মাগতে বের হয় আর বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাল সংগ্রহ করে। অনেক সময় মুসলমানদের উৎসবের সময় ছেলেমেয়ে-দের এ ভাবে সিন্নি মাগতে দেখা যায়। তখন তাদের আর আনন্দ ধরে না। বিভিন্ন ছড়া সুর করে গাইতে থাকে, হাত ধরা ধরি করে এগোতে থাকে। চাল মাগতে আসে সুতরাং চাল না নিয়ে তারা এক পা এগুতে চায় না। বারে বারে সুর করে ছড়াটি গাইতে থাকে। তখন গৃহকর্তা বা গৃহিনীরা তাদের সবাইকে চাল দিয়ে বিদায় করে। চাল পেলেই তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং নানা গুণের বর্ণনা দিয়ে কর্তাদেরকে খুশী করে যায়। চালের পরিমাণ কম দিলে বিভিন্ন দিকে তারা খুঁত বের করে গৃহিণী ও গৃহকর্তার অপমান করতেও চেষ্টা করে। তখন বাধ্য হয়ে বেশী চাল দিয়ে তাদের বিদায় করতে হয়। এরপর প্রসংশাসূচক ছড়া বলতে বলতে চলে যায় এবং অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করে।

---

১. পুরন- এক প্রকার ছোট মাছ ২. গইন্যা—এক ধরনের মাছ
৩ গুইংগা—এক প্রকার ছোট মাছ ৪ টুইক্যা--টুকিয়া ৫. হউরি--শ্বাশুড়ী
৬. পোক—পোকা

(৯)

আইলামরে অরণে[১]
লক্ষী দেবীর চরণে
লক্ষী আইয়া দিলাইন বর
চাউল কারানি বাইর কর।
চাউল দিবে না দিবে কড়ি
তবে লইয়া লড়ি দড়ি।
লড়ি দড়ি শ্যামরে
সোনার বান্দে দামরে
সোনা তর রূপের মালা
এই ঘরের গিরতাইন[২] ভালা
ও গিরতাইন দিবেন নি
গিরতাইন বড় রান্দুনী
ও গিরতাইন লড় চড়
আমারে দিবে কতদূর।
আমি তো মাগিয়া খাই
বাঘের নামে সিন্নি চাই
বাঘাই গেল নাগাইপুর
কিইন্যা আনলো চাম্পা ফুল।
একবারে একা
ঘরতে আনলো খালি টেকা
এক ভার কলার টুম
হাইরে মাইগে দিছে ঘুম।
এক গাছি গামছা
হাইরে মাউগে তামসা।

---

১. অরণে—অরণ্যে, জংগলে ২. গিরতাইন—গৃহকর্ত্রী

এক থোকা বড়ইর গাছ
মুইত্যা[1] দিল ভাজা মাছ।

(১০)

আয়রে ভাই
বাঘের পাঁচালী গাই
ষোল্ল সতর বাচ্চা নাবে
ষোল্ল সতর গাঁও
আমার বাঘুনীরে দেখছ কোন গাঁও?
আমার বাঘুনি পাগল ছাগল
আরে লক্ষীন্দর পাগল
কি কাম করিলে
মাঘ মাসের তের কাতি[2]
চাম্পা ফুল পারিলে
চাউল না চিড়া
হাচি ভরা ঘি?
আমন ধান মাগিরে
আমন ধানের ক্যামন মজা
বাঘের সিন্নি ভারী মজা।

ভরা জোৎস্নায় ছেলেমেয়েরা এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ীতে মাগতে যায় এবং জ্যোস্নার আলোয় স্নাত হয়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির সময় ছেলে মেয়েরা বিপুল আনন্দ করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যেই এ ব্যাপারে উৎসাহের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। তারা খড় দিয়ে ভোলা তৈরী করে এবং সন্ধ্যার সময় মুখে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে। পেছন দিকে আবার অনেক ছেলে মেয়ে ভাংগা কুলা কলার ডগা দিয়ে বাজাতে বাজাতে তাদের অনুগামী হয়ে দৌড়াতে

১. মুইত্যা—প্রস্রাব করিয়া ২ কাতি—কার্তিক মাস।

শুরু করে দেয়। সম্ভবতঃ এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, কার্তিক মাসতো গেল মশার কামড় খেতে খেতে, পরবর্তী মাসগুলো যাতে ভালভাবে যায় সেজন্যে আগুন লাগিয়ে দেয় ভোলার মুখে। ভোলাই হলো মশার রাজা তাই বিশ্বাস হল ভোলার মুখ পুড়িয়ে দিলে মশাও ধ্বংস হয়। ভোলা পোড়ানোর পরে চলে আর এক কৌতুকাভিনয়। কলার ডগা দিয়ে উপহাসের পাত্র পাত্রীদের পিঠ চাপড়ায়। এ সময়ে নিম্নরূপ ছড়া বলতে দেখা যায়। ভোলা পোড়ানোর সংগে সংগে কিছু সংখ্যক মশাকে এর সংগে বেঁধে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। মাছির মত অন্যান্য কীট পতংগকেও ভোলার মুখের সামনে বেঁধে নেয়া হয়। সংগে ছড়া বলতে শোনা যায়—

(১২)

ভালা আইয়ে বুড়া[১] যায়
মশা মাছির মুখ পোড়া যায়।

পল্লীর হাটে ঘাটে যে কত বেচা কেনা চলছে তার এতসব হিসেব কে রাখে ?

তবু মনে হয় পল্লীর মানুষ যা বলে তা' যেন সত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবেই সম্পর্কযুক্ত। পল্লীর মানুষের অন্তরের ব্যথাবেদনা, সুখ দুঃখ ছড়ার সঙ্গে একাত্ম। শুধু অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়েই যে এদের দিন কাটে তা নয় বরং জীবনের নানাপ্রকার পতনের মধ্য দিয়ে চলতে হয় এদের। তাই বিভিন্ন ভাবে ছড়া বলাও তাদের অভ্যাসের অন্যতম। বিচিত্রার্থক কয়েকটি ছড়ার নিদর্শন নিম্নরূপ।

(১)

এ্যাতেম ছড়া বেতম ছড়া
নাইল্যা[২] ক্ষেতে ভুবির ছড়া

১. বুড়া—খারাপ। ২. নাইল্যা—পাট

টিয়াপক্ষী করে রাও
কুজন পক্ষীর খাইট্যা পাও।

(২)

আয়রে সাধের মাস কালাই
তরে লইয়া তাস খেলাই
আয়রে সাধের মুড়ি খই
তরে পাইত্যা টুনাত লই।
আয়রে সাধের লাচারী
তরে মানাই কাচারী।

(৩)

আয়রে সাধের দীননাথ
তামুক চুংগা আইতনাত[১]
আয়রে সাধের বিশকরম[২]
কলে বলে কাম সারন[৩]
হায়রে সাধের হাওয়াইয়া
চাউট্যা[৪] মারি খেওয়াইয়া

(৪)

হরে গুরু দয়াময়
কইলে কথা মনে হয়
তুমি কেনে আইছিলা
আমিই তো গেলামগয়।

(৫)

কচু পাতার ছাউনি
জেঙ্গের ছাউনি

১· আইতনাত—বারান্দায়, ২. বিশকরন—বিশ্বকর্মা ৩. সারন—সারা, ৪· চাউট্যা—এক প্রকার ছোট মাছ

এই ঘরে তর ভাগিনা বউ
ছুঁইছ না ছুঁইছ না।

(৬)

চুল নাই বেডি চুলো লাইগ্যা কান্দে
বাইশ মোড়া পাট দিয়া
চুলের খোঁপা বান্ধে।

(৭)

আকালী সাহার বাড়ী
জংলা সারি সারি
তার মধ্যে তুলছে
একখান চৌকারী।

(৮)

কচ্‌কা ঝাড়া মচ্‌কা ঝাড়া
বিলাই হাগে ছড়া ছড়া
কুত্যা হাগে দই
এমন ঝাড়া দিয়া দিলাম
পুটকী অস্তি[১] সই।

(৯)

শান্তমনি পূজা করে
আইট্যা কলা দিয়া
গুনমনি বইয়া রইছে
পরসাদের লাগিয়া।

---

১. অস্তি—পর্যন্ত,

গুনার দই চোকা[1]
লইয়া যায় খিলাচোঁকা।

(১০)

ব্যাঙরে ব্যাঙ
কচুর তলে বাসা কেন
বুইড়ার তিন বউ
নাকে নুলুক
বুইড়া বাজায় ডুলুক।

(১১)

কার বা নাতি কার বা পুতি
কার বা ঘাড়ে দুইছে ধুতি।
কার বা ঘাড়ে করছে ছান
কেউ বা দিছে মহাজ্ঞান।

(১২)

যাই না যাই পর্বত কামে
সাড়া পড়ে ভর বিয়ানে[2]

(১৩)

শেখ চান্দের গোদার ঘাড়ে
কভু মড়ল ধান কাড়ে।

---

১. চোকা—টক, ২. বিয়ানে—সকালে

(১৪)

থাল ধনী থাল ধনী
থাল নিল চোরে
বৃন্দাবনে আগুন জ্বলে
পাত. পুত করে।

(১৫)

আম খাইও জাম খাইও
কাডাল খাইও না
কাডাল খাইলে পুলা অইলে
বাপ ডাকত না।

(১৬)

পান দিলে সুপারী লাগে
আরও লাগে চুন
গুঁসিয়া গুঁসিয়া জ্বলে
পীড়িতের আগুন।

(১৭)

আগুন আনতে গেল বুড়ি
হরে পড়লো হাত
হুর তুলিয়া বুড়ি
মাখাইয়া খায় ভাত।

(১৮)

ঘর কাডুনী কাডে সুতা
কত চিকন কত মোডা।

(১৯)

আবুর মাগো আবুর মা
আবু কেরে কান্দে
কইছনালো বইন
বিষা করতে কান্দে
জাত গেল বইন
আবুর লাইগ্যা।

(২০)

উবুনা নারী বুড়ী
চিংড়ি মাছের চরচরি
আয়রে বাবা পায় পড়ি
বউ লইয়া খেলা করি।
বউয়ের মাথায় রাঙা ফুল
বেণীতে তার গোলাপ ফুল।

(২১)

আড়ে কইলে ঠারে বুঝে
ভাংগাইয়া কইলে
বলদেও বুঝে।

(২২)

মাগো মা ঝি গো ঝি
করলে কি রং এ
ভাংগা তরী বাইতে
দিলে গাঙে

(২৩)

চাচী গো, চাচা কই ?
—চাচা গেছে নল কাড়া
নলের আগে টুনি
চাচা গেছে ভাত খাইতে
চাচী হাদে বুনি।

(২৪)

হুঁয়া হুঁয়া হুঁয়া
কান্দে মধুর মা।
মাছ নিছে বিলাইয়ে
এই আছিল কপালে।

(২৫)

আইবানি না যাইবানি
নাতিন খাওয়াইবে
সাধের মেজবানী।

(২৬)

আম গাছে কাউয়ার বাসা
ঐ দেখা যায় বিশর পাশা।

(২৭)

ঝক্কর ঝক্কর ময়মনসিং
ঢাকা যাইতে কতদিন ?

(২৮)

গাঙের পাড়ে বাঘের পাড়া
ধান লাগাইছি চাব্বিশ আড়া
ফলে ধান পাকে না
রাইত পহাইলে থাকে না।

(২৯)

গাছের মাঝে কাউয়ার বাসা
কাউয়া মারে উড়া
নাম তার বাসা উড়া

(৩০)

উত্তারি খাইলাম দুত্তারি খাইলাম
কালাই খাইয়া পেট ভরিলাম
নাকসা[১] বাইয়া ছাইড়া দিলে
থুঁথা বাইয়া পরে রে।
কালাই উড় উড় করে রে।

(৩১)

পবন ব্যাটা হনুমান
ল্যাংগুর ধইবা বাতাস আন
ল্যাংগুর গেল ছিইরা
বাতাস আয় উইরা

(নৌ-পথে নৌকাযোগে চলার সময়ে এই ছড়া আবৃত্তি করা হয়)

১. নাকসা—নাক

(৩২)

কই গেলাম রে
কই গেলাম
বড়ইর কাঁটা ফুটিয়া আইলাম।
বড়ইর কাঁটা তিলের বিষ
কি দিলে না যাইবে বিষ।

(৩৩

উতুম গুতুম কইনা রাশি
পান খাইয়া যা ভালবাস
পানের ডেডা কচু গাছ
ছাইবানুর চুলের আঁশ।

(৩৪)

উতি মুতি চৌকামুর্তি নাকখান
ধম রাজের টিকি বান
টিকত ধইরা মারলাম টান
পাথর কাটিয়া পানি আন
পর্বতের মাটি কুড়াল দিয়া কাটি
কুড়াল ভুতা মানুষের জাতা।

(৩৫)

আশী টাকায় খাশিডা
নব্বই টাকার হাডডা
ভাঙ্গিলাম তর কমরডা।

(৩৬)

উখি গুডা ঝন ঝন
জামাই আইছে তিনজন।

(৩৭)

হুনছিলাম না হাতে গুতে
হুনাইছে আমার বইন পুতে।

(৩৮)

ময়নারে বেল যাইতাছ
বেলের কপাট খুইল্যা দেখি
বাজান আইতাছইন।
—বাজান গো বাজান
মাইয়া কিতা করইন?
তোমার মাইয়ার কান্দনে
মাথা বিষ করে
উক[১] ক্ষেতের পানি দিয়া
মাথা ঠাণ্ডা করে।

(৩৯)

মাঐ ঘরে গো?
—না?
আপনের—তালই ঘরে?
তালই কিতা করইনগো?
—বুলি 'হান'[২] পাতছিলাম।
হান দিয়া কিতা লাগে?
লাইগা পরায় কাছাই ছিল
নষ্ট করছে অভিমানে।

---

১. উক—আঁখ।

২. হান—পাখী বা মাছ মারার এক ধরনের কল বা যন্ত্র।

(৪০)

রাজার বাড়ীর বাঁশ
করে ঠাস ঠাস
রাজা আইলে কইয়া দিয়াম
রুস্তম বনবাস।

(৪১)

তারে নারে তেনুয়ার ঠোঁট
মায় কইয়া দিছে
কাইন্দনারে পুত।

(৪২)

জামাই বওয়াইয় খাড়ে
গায়ে—ঝিয়ে হলদি বাড়ে

(৪৩)

বস্তার ধান বস্তাতে আছে
লাথ্যা চুড়ে বস্তা ফাড়ে।

(৪৪)

পাদ ভাজতে 'গোলা'[1] নাই
ন'ঘর কুমার।

(৪৫)

টেডি টেডি ভাব
কাপড়ের অভাব

১. গোলা - এক ধরনের পাতিল।

কাপড় নাই বাজারে
ছিপে ছিপে হাডেরে।

(৪৬)

টেডি টেডি তেজপাতা
টেডির বউ কলিকাতা
টেডি যদি জানত
চুলে ধইরা আনত।

(৪৭)

আমতলায় ঝামর ঝুমর
কাডল তলাপ বিয়া
আইতাছেগো নন্দের জামাই
গামছা মাথায় দিয়া

(৪৮)

আগের নাও ঝামর ঝুমুর
পিছের নাওগে ছইযা
ছইযার ভিতরে বইযা রইছে
গডল সাইবের মাইযা।

(৪৯)

এমন গাঙ্গো অকুণা
হলদি মরিচ বাড-ওনা
জামাই আইছে নদীর কুল
ফুইট্যা বইছে চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইবে আনন্দে।

(৫০)

বাক বাকুম করিছনারে
জালালী কইতর
বেইন্যা বেলায় দিয়াম আধার
পিঞ্জিরার ভিতর

(৫১)

আইলরে সিলকারের ছাতি
সিলকারের কুড়া
বাজারে মিলেনা ছাতি
দশ টেকা তার জোড়া ।

(৫২)

ফকির চান্দের জারি হইন্যা
যার গো লাগে তাপ
বার চান্দের গুনাহ তার
আল্লাহ্‌ করবে মাপ ।

(৫৩)

বুড়াদিলো বুড়াদি
মরিচ ক্ষেত-অ করছ কি
মরিচ ক্ষেত-অ মরিচ ফুল
আয়না দিয়া সিঁথি তোল ।

(৫৪)

ময়নার মাগো ময়নার মা
পঁচিশ পয়সায় চাইর আনা

শিং মাছের কাডা কুডা
বোয়াল মাছের দাড়ি
ময়নার মারে তুইল্যা দিলাম
'পাকিস্তানের' গাড়ী।

(এখন 'বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহার হয় এ ছড়ায়)।

(৫৫)

হলই হলই
ডুব দিয়া তলই

